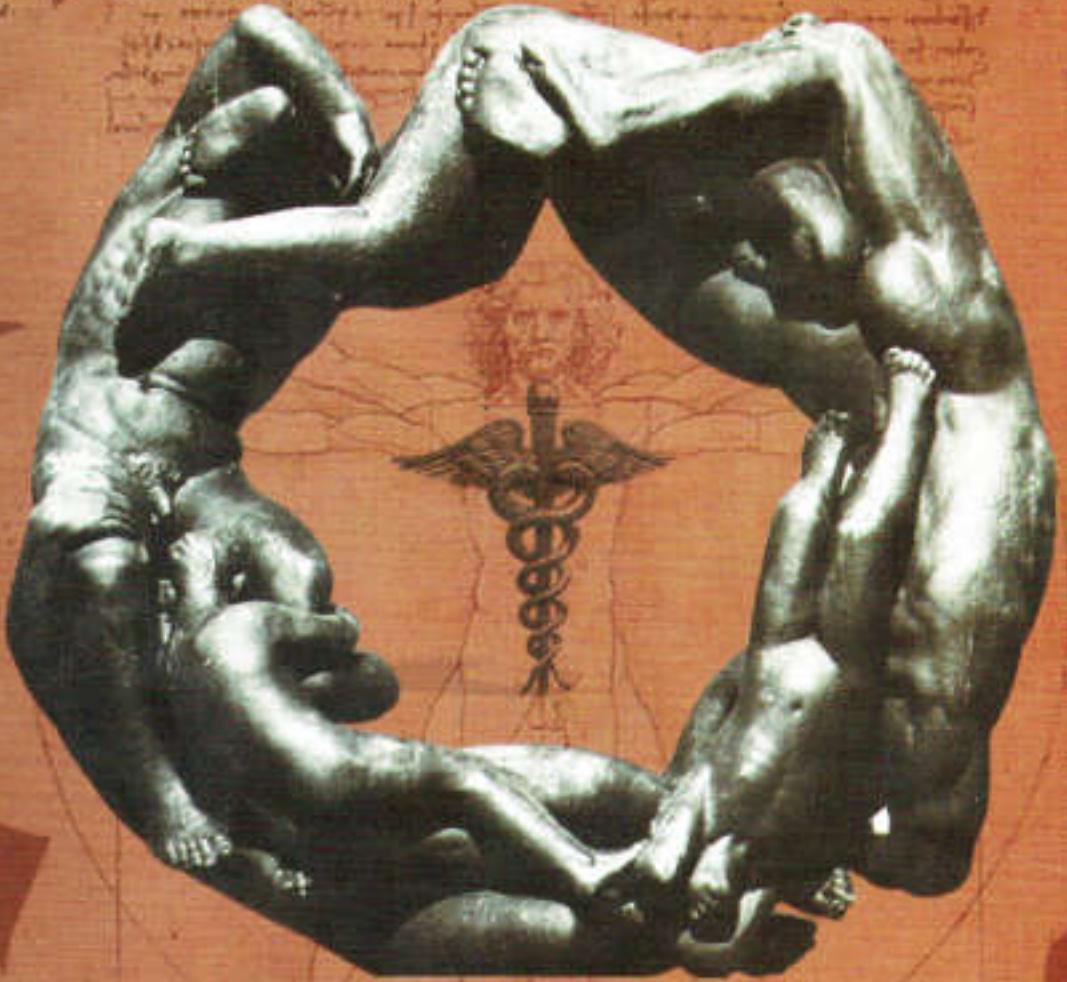


# গল্পে গল্পে রোগ আরোগ্য

ডা. আশীষ কুমার চৌধুরী



# গল্পে গল্পে রোগ আরোগ্য

ডা. আশীষ কুমার চৌধুরী

অনুপম প্রকাশনী

প্রকাশনার তিনদশকে



প্রকাশক

মিলন নাথ

অনুপম প্রকাশনী

৩৮/৪ বাংলাবাজার

ঢাকা-১১০০

প্রকাশকাল  
ফেব্রুয়ারি ২০১০



লেখক

প্রচন্দ ও অলক্ষণ  
জিয়াউদ্দিন চৌধুরী

বর্ণবিন্যাস

সূচনা কম্পিউটার্স

৪০/৪১ বাংলাবাজার

ঢাকা-১১০০

মুদ্রণ

ঢাকা প্রিন্টার্স

৩৬ শ্রীশদাস লেন

ঢাকা-১১০০

মূল্য

১৩০.০০ টাকা মাত্র

ISBN 984-70152-0142-5

---

GALPE GALPE ROOG AROGYA by Dr. Ashish Kumar Chowdhury

Published by Milan Nath. Anupam Prokashani

38/4 Banglabazar Dhaka-1100

Price : Tk. 130.00 Foreign US\$ 5.00.

উৎসর্গ

আমার পরমারাধ্যা মা  
শ্বর্গীয় নিরূপমা চৌধুরীর  
করকচলে





## শুভেচ্ছা বাণী

আমার স্নেহভাজনদের অন্যতম ডা. আশীষ কুমার চৌধুরী। তিনি একজন লক্ষ-প্রতিষ্ঠ শল্যচিকিৎসক এবং আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিজ্ঞ শিক্ষক। সুদীর্ঘ সময় ধরে শল্যচিকিৎসার অভিজ্ঞতা ও শিক্ষকতা পেশার আলোকে তিনি গঁজে গঁজে রোগ আরোগ্য গ্রহণ করে রাখেন। এজন্য তাঁকে আমি সাধুবাদ জানাই।

ডাক্তার আশীষ কুমার চৌধুরী লিখিত বইটি পড়ে আমার যে ধারণা হয়েছে তা হলো— তিনি সমাজ সচেতনতা ও দেশপ্রেমের অনন্দৃষ্টি দিয়ে বইটি রচনা করেছেন। চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্পর্কে সাধারণে প্রচলিত কুসংস্কারগুলোকে নিরুৎসাহিত করেছেন এবং সেই সাথে অপচিকিৎসার কুফল সম্পর্কে জনসাধারণকে সচেতন করতে চেষ্টা চালিয়েছেন। পেটের হঠাত যন্ত্রণার বিশেষ কারণগুলো এবং তার প্রতিকার পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন সুনিপুণভাবে। গল্পকথায় সমাজের অচলায়তন ভেঙে জনমন থেকে রোগভীতি দূর করে সঠিক চিকিৎসালাভের দিকনির্দেশনা ও তিনি দিয়েছেন। গঁজে গঁজে রোগ আরোগ্য নামটি তাই যথার্থ। আত্ম-সমালোচনায় তিনি অকুতোভয়। গল্পছলে সাহিত্যের নির্যাসে জনমনে সচেতনতা সৃষ্টির যে প্রণোদনা, সেখানে তিনি সার্থক এবং তাঁর গ্রন্থটি শিল্পের মাত্রায় উন্নীত।

তাঁর এ গ্রন্থটি পাঠকন্দিত হবে— আমি নিশ্চিত। আমি ডা. আশীষ কুমার চৌধুরী প্রণীত গ্রন্থটির বহুল প্রচার প্রত্যাশা করছি।

নূরুল ইসলাম

(ডা. নূরুল ইসলাম)  
জাতীয় অধ্যাপক

অতিথাতা উপাচার্য, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম।

## শুভেচ্ছা বাণী

বাংলাদেশের স্বাস্থ্যব্যবস্থা এখনও দুর্বল। গত অর্ধশতকে চিকিৎসকের সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পেলেও দেশে ডাক্তার-রোগীর অনুপাত এখনও আঁতকে ওঠার মতো। এই অনুপাতে শহর-পল্লীর পার্থক্যও প্রকট।

এ দেশে আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থার প্রচলন খুব আগে হয় নি। বছর ষাট-সত্তর আগেও এল.এম.এফ ডাক্তারদের হাতে গোনা যেত। তবে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের মতো দেশীয় পদ্ধতিতে নানা চিকিৎসা ছিল- কবিরাজী, শাস্ত্রী, মঘা নানারকম নামে। শল্য চিকিৎসা এদেশে মূলত: ষাটের দশকের ব্যাপার।

এরকম অবস্থায় বহু রোগী যে শুধু বিনা চিকিৎসায় নয়, রোগ সম্বন্ধে না জেনেই মারা যেত সেরকম বহু ঘটনা আছে। মাতৃমৃত্যু, শিশুমৃত্যু, সংক্রামক রোগে ঘামের পর গ্রাম উজাড়, নানা কুসংস্কারে চিকিৎসার চেষ্টা ছাড়াই মারা যাওয়া- এসব ছিল সুপরিচিত দৃশ্য।

শিল্পোন্নত দেশগুলির মতো বার্ষিক চেকআপ আমাদের দেশে এখনও ভাবা যায় না। ফলে আমাদের রোগ ধরা পড়ে অনেকটা ক্ষতি হয়ে যাওয়ার পরে অথবা যখন চিকিৎসার আর তেমন কিছু থাকে না। অথচ রোগ সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান অথবা সচেতনতা থাকলে অনেক প্রাণ রক্ষা করা সম্ভব।

ডাক্তারি বিদ্যার বই সাধারণ মানুষ পড়বে না। কিন্তু যদি নানা ঘটনার উপস্থাপন বা গল্প বলার মধ্য দিয়ে মানুষকে রোগ সম্পর্কে সচেতন করা যায়, তা হলে অনেক রোগ নিরাময় হতে পারে। ড. আশীষ কুমার চৌধুরী গল্পে গল্পে রোগ আরোগ্য বইতে সেই চেষ্টাই করেছেন। এ জন্য তাঁকে অভিনন্দন জানাই।

ড. আশীষ একজন শল্য চিকিৎসক। কথায় বলে, সার্জনদের মেজাজ গরম। কিন্তু বর্তমান গ্রন্থে শল্য চিকিৎসক যেভাবে রসিকতা করেছেন তা অত্যন্ত উপভোগ্য হয়েছে। তাঁর সংক্ষারমুক্ত প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের উপরি পাওনা।

আমি বর্তমান প্রকাশনার জনপ্রিয়তা কামনা করি।

১৫-১৬ মে ২০০৯  
(ড. সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ)

প্রাক্তন মহাপরিচালক  
বাংলা একাডেমী, ঢাকা

## আমার কথা

অপার সম্ভাবনার দেশ আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ। এ দেশকে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিতে হলে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন মানুষের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ। অর্থাৎ সবার জন্যে অন্ন-বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থান নিশ্চিত করা। আর এসব বাস্তবায়নে দরকার শিক্ষিত, সমাজসচেতন, স্বাস্থ্যবান, দেশপ্রেমিক জনগোষ্ঠী। কিন্তু দেশের এ জনগোষ্ঠীর বিশাল অংশ প্রকৃত স্বাস্থ্যসেবা গ্রেকে বন্ধিত। অন্যদিকে তাদের রয়েছে প্রকৃত স্বাস্থ্যসচেতনতার অভাব। পাশাপাশি বিভিন্ন কুসংস্কার ও অপচিকিৎসার কবলে পড়ে তারা অনেক সময় প্রকৃত চিকিৎসাসেবা থেকে বন্ধিত হচ্ছে। এমনকি জীবনও হারাচ্ছে। তাদের সুচিকিৎসার জন্যে দরকার একটি সুন্দর ও যুগোপযোগী স্বাস্থ্য-ব্যবস্থা। প্রয়োজন একটি দক্ষ ও দেশপ্রেমিক চিকিৎসক গোষ্ঠী। সর্বোপরি প্রয়োজন স্বাস্থ্যবান্ধব সামাজিক বাতাবরণ। এ সত্য অনুধাবন করে জনসাধারণকে স্বাস্থ্যসচেতন করার উদ্দেশে আমার এই ছোট প্রয়াস গল্লে গল্লে রোগ আরোগ্য। যেমন পেটের মারাত্মক কিছু সমস্যা হঠাতে করে সৃষ্টি হয় যা যে কারো জীবনের স্বাভাবিক ছন্দকে মুহূর্তেই বিপদসংকুল করে তুলতে পারে। এখানে গল্লের আঙিকে সেসব বিপদ সম্পর্কে চিকিৎসা-তথ্যসমূক্ষ সমাধান দেয়া হয়েছে। মহান একুশের ভাষা শহীদদের আত্মত্যাগের প্রতি আমার অন্তরের গভীরতম শুক্রাবোধের বহি:প্রকাশ গল্লে গল্লে রোগ আরোগ্য যাতে স্থান পেয়েছে একুশটি গল্ল। প্রতিটি গল্লে সমাজের বিশেষ কিছু প্রয়োজনীয় বিষয় চিহ্নিত করে দেশপ্রেমের অকৃত্রিম মানসিকতা নিয়ে তা সমাধানের আবেদন জানিয়েছি। আশা করি, আমার এ প্রচেষ্টা সমৃক্ষ বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

বইটি গ্রন্থাকারে প্রকাশে উদ্যোগী ভূমিকা নেয়ার জন্য প্রিয় সুহৃদ দীপেন চৌধুরী, নির্বাহী সম্পাদক, সাংগীতিক সাহসী ঠিকানা ও আলোকিত বোয়ালখালী পত্রিকার সম্পাদক মো. তাজুল ইসলাম রাজুর কাছে আন্তরিক কৃতজ্ঞ।

১১২০১৩

(ড. আশীর কুমার চৌধুরী)

চট্টগ্রাম

২৫ ডিসেম্বর ২০০৯



## সূচিপত্র

রূপা আর কোনো দিন মা হবে না ১১  
কমলা আজও কাঁদে ১৮  
তমা জীবন হারাতে বসেছিল ২২  
বড় বাঁচা বেঁচে গেছে ইউনুস ২৯  
পূর্ণিমা মধুময় দিনের স্বপ্ন দেখে ৩৫  
যশ্চা হলে রক্ষা নাই কথাটা সত্যি নয় ৩৯  
হৃদয়ের একূল ওকূল ৪৪  
সজীব একা নয় ৪৮  
হঠাতে ব্যথার কারণ-অকারণ ৫২  
পেটের সে এক আজব টিউমার ৫৫  
নিজামউদ্দিনের পিতৃশূল ৫৯  
নয়নের ঢোকে ডাঙ্কার হবার সোনালি স্বপ্ন ৬৪  
এখন সময় ভাববার ৬৭  
মা আজ বড় একা ৭০  
পরীর দ্বীপের নতুন বউ ৭৪  
যে আগুন সহজে নেভে না ৭৮  
গলায় ফাঁস ৮৩  
সত্যজিতের সত্য রক্ষা ৮৭  
রমজান আলীর শৈশব-বেদনা ৯১  
কুসুমের কষ্ট ৯৫  
খুঁজে ফিরি সেই বুড়ো রোগীটাকে ৯৯



## ରୂପା ଆର କୋନୋ ଦିନ ମା ହବେ ନା



କାଜକର୍ମ ସେରେ ନିର୍ଧାରିତ ସମୟେର ଅନେକ ଆଗେଇ କମଳାପୁର ସେଟଶଳେ ପୌଛିଲାମ । ଚଟ୍ଟଥାମ ଫିରିତେ ହବେ । ବ୍ୟନ୍ତ ନଗରୀ ଢାକା । ଯାନଜଟ, ଗାଡ଼ିର କାଲୋ ଧୋଯା, ଧୁଲୋବାଲି, ମାନୁଷେର ଭିଡ଼ ଏ ଯେନ ଶହରେର ଚିରନ୍ତନ ରୂପ । କେଉଁ କେଉଁ ବଲେନ, ଢାକାର ବାତାସେ ଟାକା ଉଡ଼େ । ଅନେକେ ଏ ଟାକା ଧରାର ଜନ୍ୟ ଢାକା ପାଡ଼ି ଜମାୟ । ଅବଶ୍ୟ ଆମାର ବେଳାୟ ଅନ୍ୟ କଥା । ଆମି ଗିଯେଛି ଟାକା ଉଡ଼ାତେ । ଦିନଭର ହେଟେ ହେଟେ କାଜ ସାରିତେଇ ବେଳା ଶେଷ । ସାଥେ ଆମାର ଛୋଟ ଭଣ୍ଡିପତି, ସବ କାଜେ ସହ୍ୟୋଗିତା କରଛେନ । ଫିରତି ଟ୍ରେନେର ଟିକେଟ ପେତେ ବେଶ ବେଗ ପେତେ ହେଯେଛିଲ । ସକାଳେ ଟ୍ରେନ ଥିକେ ନେମେଇ ଫିରତି ଟ୍ରେନେ ଫେରାର ଚିନ୍ତାଯ ବ୍ୟନ୍ତ ହେଯେଛିଲାମ । ଏଇ କାଉନ୍ଟାର, ସେଇ କାଉନ୍ଟାର କରିତେ କରିତେ ପାଯେ ଶୂଳ ଧରିଲ । ସବଖାନେ ଶୁଦ୍ଧ ନେଇ, ନେଇ ଜବାବ । ଉପାୟାନ୍ତର ନା ଦେଖେ ସେଟଶଳ ମାସ୍ଟାରେର ଶରଣାପନ୍ନ ହଲାମ । ଉନି ଆମାଦେର ଜରୁରି ଫେରାର ପ୍ରୟୋଜନୀୟତା ବୁଝିତେ ପେରେ ଦୁଟୋ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ପ୍ଲିପିଂ କୋଚେର ଟିକେଟ ମ୍ୟାନେଜ କରେ ଦିଲେନ । କୋନୋ ବାଡ଼ି ଟାକା ଦାବି କରେନନି । କରଲେ ତାର ଇଚ୍ଛା ହୟତେ ଆମାଦେର ପୂରଣ କରିତେ ହତେ । ସମୟଟା ଅବଶ୍ୟ ତଥନ ଛିଲ ଅନ୍ୟ ରକମ । ଦେଶେ ଜରୁରି ଅବଶ୍ୟା ଚଲାଇଲ । ଅନେକ ଜାଯଗାଯ ଆର୍ମି ସିଭିଲ ଡ୍ରେସ୍ ତଦାରକି କରଛେନ । କୋଥାଯ, କଥନ, କେ ଜନ୍ମ ହନ, ତା ବୁଝେ ଅନେକେ ତଥନ ଖାଟି ମାନୁଷ ହେଯେ ଗେହେନ । ନାମୀ-ଦାମୀ ଗାଡ଼ି ରାନ୍ତାଯ ଫେଲେ ମାଲିକ ଲାପାଭା ହେଯେଛେ । କେଉଁବା ଘରେର ପୋଷା ହରିଣ ଆର ପୋଷା ଅଜଗର ରାନ୍ତାଯ ଛେଡ଼େ ଦିଯେଛେନ । ସେ ଅନେକ କଥା... ।

ট্রেন আসতে তখনো অনেক দেরি। দেখতে দেখতে আশেপাশের চেয়ারগুলো লোকজনে ভরে গেল। সবাই যাত্রী কিনা তা বুঝতে পারিনি। আধ বয়সের এক পুরুষ। খুব সম্মত মানসিক রোগী।

বেশ বড় গলায় হাঁক দিল, ‘এগারটার ট্রেন আসবে কটায়। রাত দুটোয় যদি আসে, ছাড়বেই বা কটায়। যাত্রী ভাই-বোনেরা, সবাই আমার সাথে কঠ মিলিয়ে মিছিল করে বলুন, টাইম ইজ মানি’। এসব বলে বলে সে দিঘিদিগ পায়চারি করতে লাগল। অনেকেই তার দিকে দেখে দীর্ঘশ্বাস ফেলল। আবার কেউবা মুচকি হাসল।

রাত তখন বারোটা। ট্রেন এসে পৌছায়নি। লোকটা অনেকগুলো পুরনো টিকেট হাতে জড়ো করে বলল, ‘একশ টিকেট কেটেছি। কাউন্টারে টিকেট নেই বলে কে? শালার ট্রেন, ঠিক টাইমে না এলে আমি শুশুরবাড়ি যাই কী করে?’

স্টেশনে মাইকে ঘোষণা এল, অনিবার্য কারণে ট্রেন আসতে দেরি হবে। যাত্রী ভাইয়েরা যারা অপেক্ষা করতে পারবেন না তারা টিকেটের মূল্য ফেরত নিয়ে যেতে পারেন। পরদিন জরুরি কাজ না থাকলে হয়তো তাই করতাম।

পাশে কয়েকজন যুবকের ঘোরাফেরা কেমন জানি অস্বাভাবিক মনে হচ্ছিল। আমার আবার অস্বাভাবিকতা দ্রুত চোখে পড়ে। ডাঙ্গার বলে কথা। ওরা ঘনঘন আমার দিকে তাকাচ্ছিল। পাশে জামাইবাবুও নেই। কোথাও হয়তো সিগারেট ফুঁকতে গেছে। আমাকে একা দেখে ওরা আরো তৎপর হয়ে উঠল যেন। তা হলে ওরা কি মলম কিংবা অঙ্গান পার্টির লোক! ভাবি বিপদের ব্যাপার তো পকেটে, হাতে ও ব্যাগে আমার অনেক কিছুই আছে। যদি ওরা আমাকে অঙ্গান করে সব নিয়ে নেয়! কিংবা মেরেই বসে! এসব ভাবতে ভাবতেই জামাইবাবু হাজির। মুখ থেকে সিগারেটের গন্ধ বের হচ্ছিল। ও হয়তো অবস্থা বুঝতে পেরেছিল।

‘শুনুন, আপনারা কি আসছে ট্রেনের যাত্রী? টিকেট দেখা যাবে?’

ওকথা বলতেই বেশ কিছু যুবক কেটে পড়ল।

‘বেটারা বাটপারি করার জায়গা আর পাসনি?’

জামাতার সাহস দেখে আমারও সাহস বেড়ে গেল। বুঝতে দেরি হয়নি, যুবকদের বেশ কয়েকজন সত্যিই ঐসব দলের লোক। সুযোগের অপেক্ষায় ছিল।

রেলওয়ে পুলিশরা সব গেল কোথায়? হায় স্বদেশ! যাত্রীদের নিরাপত্তা দেবে কে?

ডানপাশের চেয়ারে বসা কালো চশমা চোখে এক ভদ্রমহিলা সবকিছু লক্ষ করছিলেন। হাতে ঐ দিনের তাজা সংবাদপত্র। তা দিয়ে কখনো বা মুখ জেকে রাখছিলেন। বয়স ষাটের কাছাকাছি হবে। দেহের গড়ন বেশ সুন্দর। পাশে বড় একটা ল্যাগেজ। এসব দেখে মাঝে মাঝে মৃদু হাসছিলেন। কে এই ভদ্রমহিলা? আর্মি ইনটেলিজেন্স! বোধহয় ট্রেনের যাত্রী। ভদ্র মহিলার বেশ সাহস আছে। একা একা এত রাতে যাবেন কোথায়?

রাত আড়াইটা। বহুল কাঞ্জিকত ট্রেন প্ল্যাটফরমে এসে থামল। পাগলটা আবার কোথা থেকে এসে চিৎকার করে বলতে লাগল, ‘ভাই-বোনেরা তৈরি হউন, এখনি আমাদের যাত্রা শুরু হবে। ১২টার ট্রেন নিশ্চয় তিনটায় ছাড়বে। বিনা টিকেটে ভ্রমণ করবেন না। টিকেট না থাকলে আমার কাছে বিনা পয়সায় নিতে পারেন’। কে তার বকবকানি শোনে। যাত্রীরা দৌড়াতে লাগল নিজ নিজ কমপার্টমেন্টের দিকে। আমরাও তাই। ট্রেনে উঠে পড়লাম।

আমার আর জামাইবাবুর প্রিপিং রুম পাশাপাশি। আমার বাম পাশেই ঐ ভদ্রমহিলার কক্ষ। চোখাচোখি হতেই বললেন, ‘বেশি ঘুমাবেন না, স্টেশন ফেল করবেন। কফির দাওয়াত থাকল’।

কুমে ঢুকে বিছানাপত্র গুছিয়ে ঘুমাবার ব্যবস্থা করলাম। পাশের কুমে জামাইবাবু ততক্ষণে নাক ডাকছে। দিনভর হাড়ভাঙ্গা খাটুনি গেছে বেচারার।

অন্য কক্ষগুলোয় খাটো চুলের সব জোয়ান। নিশ্চয়ই আর্মির লোক। অফিসার ব্যাংকের হবে। বাংলা আর ইংরেজি মিশিয়ে নিজেদের মধ্যে বেশ আলাপ জমিয়েছে।

তিনটার দিকে ট্রেন যাত্রা শুরু করল। ট্রেনের গড়গড় শব্দে কিছুতেই ঘুম আসছিল না। দরজা খুলে বারান্দায় আসলাম। দেখি, ভদ্রমহিলা ওখানে বসে আছেন। বারান্দায় আলো থাকলেও বাইরে বেশ অঙ্ককার। কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। তবে উনি বাইরে কী দেখছেন! আমাকে লক্ষ করে বললেন, ‘কি ভাই, ঘুম আসছে না? কফির ব্যবস্থা করলো’।

অ্যাটেনডেন্ট ডাকলাম। গরম কালো কফি হাতে নিয়ে আলাপ শুরু করলাম।

ভদ্রমহিলার নাম কুপা। পুরো নাম জানার দরকার নেই, তিনি এমনটিই বললেন। বাড়ি টাঙ্গাইল জেলায়। বর্তমানে এক বিদেশি সংস্থায় নির্বাহী পদে ভালো বেতনে চাকরি করেন। ঢাকা ভাস্টিত থেকে ইংরেজিতে মাস্টার্স করেছেন। অফিসের কাজে ঘন ঘন দেশ ভ্রমণ করতে হয়। মুখে, হাতে কয়েকটা কাটা দাগের চিহ্ন। হালকা আলোতে ঠিক বোঝা যাচ্ছিল না।

‘কী দেখছেন? না, না, কোনো দুর্ঘটনায় পড়িনি’।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, ‘একান্তরের হায়নার দাঁত আর নথের ক্ষতচিহ্ন। তখন ঢাকা ভাস্টিতে ইংরেজি সাহিত্যে হিতীয় বর্বে পড়তাম। মার্টের এক গভীর রাতে ওরা রেড দিল আমাদের হোস্টেলে। চারদিকে শুধু মেয়েদের আর্তনাদ। কোথায় কী হচ্ছে ঠিক বুঝতে পারিনি। ওরা কুমের লাইট অফ করে দিয়েছিল। তবে অনুমান করেছিলাম কেউ অক্ষত নেই। রাতের অঙ্ককারে তারা আমার লম্বা চুলের বেণি ধরে টেনেছিচড়ে জিপে তুলে নিল’।

তারপর?

জ্ঞান ফিরলে দেখি, পুরনো বাড়ির একটা বড় কক্ষ। দরজা-জানালা সব বক্ষ। দুটো ফটকে চড়ুইপাথির বাসার ফাঁক দিয়ে সূর্যের কিছু আলো আসছে। হয়তো

তখন সকাল। আমি সম্পূর্ণ বিবস্ত। দূরে আমার জামা-কাপড় ছেঁড়া-বেড়া ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। আমার মুখ, হাত, স্তন ও গোপন অংগ থেকে বেশ রক্ত ঝরছে। ওড়নাটা গলায় জড়ানো আছে। দূরে বড় এক খাটে পাশাপাশি আরো দুই বিবস্ত মহিলা। তারা কি আমার ভাসিটিরই ছাত্রী! হয়তো তাই হবে। শরীরে আর শক্তি নেই। নড়তেই যেন দম ফুরিয়ে আসছিল। কোনো রকমে পা টেনে টেনে ওদের কাছে গেলাম। দুজনেই মৃত। আমার ছেঁড়াবেড়া কাপড় দিয়ে ওদের লজ্জা ঢেকে দিলাম। ওড়না দিয়ে আমি আমার বুক আর নিম্নাঙ্গ ঢেকে নিলাম। হঠাতে বড় দরজাটা খুলে গেল। দুজন বন্ধুকধারী এসে ঢুকল। ‘নো নো, ওসবের দরকার কি। তেরি সেভ। টু ডেভ, ওয়ান অ্যালাইভ’।

ওরা টান মেরে আমার ওড়নাটা খুলে নিয়ে বলল, ‘ইউ আর ভেরি বিউটিফুল। হোয়াটস ইয়োর নেম? উই উইল নট কিল ইউ। ইউ আর নিডেড’।

আমি সুন্দরী। আমাকে ওদের দরকার। বাঁচবার আশ্বাস পেয়ে গেলাম। হ্যাঁ, আমি বাঁচতে চেয়েছিলাম। আমার ভেতর প্রতিশোধের আগুন দাউ দাউ করে জুলছিল।

আমাকে নিয়ে গেল আর্মি কোয়ার্টারে। তারপর শুধু হাত আর খাঁচা বদল। আজ এখানে তো কাল ওখানে। ভালো ইংরেজি বলতে পারতাম বিধায় অনেকের প্রিয় হয়ে উঠলাম। আমাকে উপরের স্তরের অফিসার্স কোয়ার্টারে নিয়ে গেল। দিন দিন প্রতিশোধের নেশা আমাকে ধূর্ত থেকে ধূর্ততর করে তুলল। ওদের খাওয়া-দাওয়া, নাস্তার টেবিল, খোশগল্লের আসরে আমার ঠাই হলো।

পরিবারের সবার কথা সব সময় মনে পড়তো। বাড়িতে বুড়ো মা-বাবা। ঢাকা ভাসিটিতে আরো দুভাই পড়ত। ওদের কী হলো। খৌজ নেয়ার সুযোগ হয়নি।

মে মাসের শেষ দিক হবে। সকালে নাস্তার টেবিলে আর্মিদের সাথে খোশগল্লে মেতে উঠলাম। এক আর্মি অফিসার হাসতে হাসতে বলল, ‘মিস রূপা, ইউ ওয়ান্ট টু সি মুক্তি’?

এক তাগড়া হাত-মুখ-চোখ বাঁধা জোয়ান এনে বুকে লাথি মেরে আমার পায়ের কাছে ফেলল।

‘হি ইজ মুক্তি। দেশদ্রোহী, ত্রিমিন্যাল। উই উইল কিল হিম’।

মুক্তি! কে এই মুক্তি! আমার ছেট ভাই। সবুজ। সারা শরীর তার রক্তে রঞ্জিত। আমি অট্টহাসি দিয়ে বললাম, ‘শালার মুক্তি, বেশ তাগড়া তো তুই। তোকে দিয়ে আমি রান্নার কাজ করাব। স্যার, ডোন্ট কিল হিম। হি কেন সার্ভ আস’।

তার চোখের জল শুকিয়ে গেছে। আমার দিকে একবার তাকিয়ে দ্রুত চোখ ফিরিয়ে নিল। পেছনে লাথি মেরে মেরে ওরা তাকে রান্নাঘরের দিকে নিয়ে গেল।

অনেক দিন পর ত্ত্বিভরে নাস্তা করার সাধ জাগল। দু টুকরো পাউরণ্টির টোস্টের মাঝখানে মাখন লাগিয়ে মুখে দিলাম। হঠাতে করে তলপেটে খুব ব্যথা অনুভব হলো। বমি হলো। পেটে যা ছিল সব বের হয়ে গেল।

এমনিতেই দু মাস ধরে খাওয়ায় তেমন রুচি নেই। সব সময় বমি বমি ভাব। শুটে পিরিয়ড হয়নি। বুৰাতেই পারছেন। সময় ও সুযোগের অপেক্ষায় ছিলাম। মাসকের রাস্তা দিয়ে রক্তপাত শুরু হলো। বড় সাহেব সব লক্ষ করলেন। আদরের শূরে বললেন,

- ওয়াটস উইথ ইউ, মিস রূপা?
- খুব খারাপ লাগছে স্যার।
- কল এ ডেটেল ইমিডিয়েটলি।

অ্যাম্বুলেন্স এসে আমাকে হাসপাতালে নিয়ে গেল। পেটের অসহ্য ব্যথা আর রাত্নম্বাবে আমি বেশ দুর্বল হয়ে পড়লাম। সন্ধ্যায় মাসকের রাস্তা দিয়ে ছোট মাংসপিণি বের হলো। তবু পেট ব্যথা ও রক্তক্ষরণ বন্ধ হলো না। রাতে ডাঙ্কার এসে আমাকে ওটিতে নিয়ে গেলেন। আমার জরুরি অপারেশন হলো। জ্ঞান ফিরে গেল। ডাঙ্কার হসেইন বললেন,

- মিস রূপা, আমি খুব দুঃখিত। জীবন বাঁচাতে আপনার জরায়ু কেটে বাদ দিতে হয়েছে। আপনি আর কোন দিন মা হতে পারবেন না।

হৃদয়ের বেদনা হৃদয়েই লুকিয়ে বললাম,

- আমার আর মা হওয়ার ইচ্ছে নেই। মহান আল্লাহর অশেষ কৃপা, আমাকে এভাবে মা হতে হয়নি।

রূপার বেদনা-বিধুর জীবনকাহিনী ওনে নিশ্চয় গর্ভপাতের বিভিন্ন বিষয় জানতে আগ্রহ হচ্ছে। গর্ভপাত কী? কেনই বা গর্ভপাত হয়, গর্ভপাতের বিভিন্ন জটিলতাই বা কী? গর্ভপাতে পেটে হঠাত ব্যথা হয় কি না, এসব বিষয়ে কিছু আলোকপাত করা প্রয়োজন।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সংজ্ঞানুসারে গর্ভপাত বা অ্যাবরশন হচ্ছে: পাঁচশত গ্রাম বা এর চেয়ে কম ওজনের ভ্রংণ বা বাচ্চা যখন স্বাধীনভাবে জরায়ুতে বাঁচতে পারে না এবং কোন কারণে তা জরায়ু থেকে বের হয়ে আসে বা বের করে আনা হয়।

গর্ভপাত বিভিন্ন ধরনের এবং তা বিভিন্ন কারণে হয়ে থাকে। বিভিন্ন পরিসংখ্যান অনুসারে শতকরা ১০-২০ ভাগে ক্ষেত্রে মায়েদের ভ্রংণ গর্ভপাত হয়ে থাকে। এর শতকরা দশ ভাগ হয় ইচ্ছানুসারে, সঙ্গত কোনো কারণে। গর্ভপাতের বিভিন্ন কারণগুলোর মধ্যে ভ্রংণের ক্রেমোজম ভ্রংণ, থাইরয়েডের বিভিন্ন রোগ, বহুমূত্র বা ডায়াবেটিস, ম্যালেরিয়া, রুবেলা, এইডস ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। তা ছাড়া ধূমপান, অতিমাত্রায় মদ বা নেশাজাতীয় দ্রব্য সেবন বা কিছু বিশেষ ওষুধ সেবন গর্ভপাতের কারণ হতে পারে। তবে শতকরা ৪০-৬০ ভাগ ক্ষেত্রে এর সঠিক কারণ খুঁজে বের করা সম্ভব হয় না।

গর্ভপাত বিভিন্ন ধরনের। এদের মধ্যে অসম্পূর্ণ ও সেপটিক গর্ভপাত অত্যন্ত মারাত্মক ও মৃত্যুরুক্ষিপূর্ণ। অসম্পূর্ণ গর্ভপাতের ক্ষেত্রে ভ্রংণের কিছু অংশ বের হয়

এবং কিছু অংশ জরাযুতে থেকে যায়। ফলে তলপেটে খুব ব্যথা হয় এবং মাসিকের রান্তা দিয়ে প্রচুর রক্তস্ফুরণ হয়। এ ধরনের সমস্যা হলে অবশ্যই স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ অনুযায়ী চিকিৎসা নিতে হবে। স্বপ্নগোদিত হয়ে কিংবা প্রশিক্ষণহীন ধাত্রী দিয়ে এর চিকিৎসা করার পরিণতি অত্যন্ত মারাত্মক। এতে অনেক সময় ইনফেকশন জরাযুপথে শরীরের অন্যান্য স্থানে ছড়িয়ে পড়ে ও মৃত্যুবুঝি দেখা দেয়।

রোগের সঠিক ইতিহাস জেনে ও প্রয়োজনমতো বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা যেমন : পেগনেঙ্গি টেস্ট, কিংবা পেটের আলট্রাসন্ডোগাফি করে সহজেই এ রোগ নিন্দণ করা সম্ভব। রোগীকে অবশ্যই হাসপাতালে ভর্তি করাতে হবে। সঠিক এন্টিবায়োটিক প্রয়োগ করাতে হবে। ভ্রণের অবশিষ্ট অংশ ডিএন্ডসি করে বের করে দিতে হবে। এতে রোগী সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেন ও পরবর্তীতে গর্ভধারণও করাতে পারেন।

সেপটিক অ্যাবরশন অত্যন্ত জটিল সমস্যা। এ রোগে জরায়ু, তলপেট এমনকি রক্তের মাধ্যমে সারা শরীরে ইনফেকশন ছড়িয়ে পড়ে। ফলে গায়ে জ্বর আসে, শিরা দ্রুত চলে, খাদ্য অরুচি হয় এবং রক্তচাপ কমে যায়। তলপেটে খুব ব্যথা হয়। মাসিকের রান্তা দিয়ে দুর্গক্ষম পুঁজ-পানি বের হয়। ধনুষ্টংকার ও গ্যাস গ্যাংগ্রিনের জীবাণুর মতো মারাত্মক জীবাণু জরাযুপথে শরীরে চুকে যায়। সঠিক সময়ে এর চিকিৎসা করাতে না পারলে মৃত্যুও ঘটতে পারে। সাধারণত গায় ও বন্তির মতো অন্ধসর এলাকার মায়েদের এ ধরনের সমস্যা দেখা যায়। এ রোগের মারাত্মক পরিণতির কথা চিন্তা করে রোগীকে জরুরি হাসপাতালে ভর্তি করাতে হবে। মহিলারোগ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিয়ে যথাযথ চিকিৎসা নিশ্চিত করাতে পারলে জীবন বাঁচানো সম্ভব। পরবর্তী সময়ে মায়েদের অনেক সময় বাচ্চা হয় না কিংবা অস্বাভাবিক স্থানে গর্ভধারণ হয়।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পরিসংখ্যান অনুসারে গর্ভপাতের শতকরা নবাই ভাগই পরিলক্ষিত হয় দরিদ্র ও উন্নয়নশীল দেশগুলোতে। মাতৃমৃত্যুর শতকরা তের ভাগই সংঘটিত হয় এ ধরনের গর্ভপাতের কারণে। তাই গর্ভপাত ও এর চিকিৎসা পদ্ধতি সমুক্ষে উপযুক্ত প্রশিক্ষণের প্রয়োজন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, মায়েদের পিরিয়ড মিস হলে এবং তলপেটে হঠাত ব্যথা হলে, মাসিকের রান্তা দিয়ে রক্তস্ফুরণ হলে গর্ভপাতজনিত সমস্যা হয়েছে এমনটি সন্দেহ করাতে হবে এবং মহিলারোগ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ অনুযায়ী দ্রুত ব্যবস্থা নিতে হবে।

কুপা ডাক্তার হসেইনের সহযোগিতায় হাসপাতালে মেডিকেল সিস্টারের কাজ পেয়ে যান। অতি অল্প সময়ে মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে তার যোগাযোগ গড়ে ওঠে। শক্রপক্ষের অবস্থান ও অন্যান্য তথ্য নিয়মিত মুক্তিবাহিনীর কাছে সরবরাহ করাতেন। মুক্তিযুদ্ধে আহত অসংখ্য ভাইবোনকে সেবা ও স্নেহ দিয়ে বাঁচিয়ে

তুলেছেন। অনেক চেষ্টা করেও অফিসার্স কোয়ার্টারে কর্মরত ভাইয়ের সাথে তার আর দেখা যেলেনি।

রূপা দেশ স্বাধীন হলে লাল-সবুজের পতাকা হাতে ফিরে গেছেন নিজ গ্রামের ভিটোয়। খালি ভিটো দেখে অনেক দিন, অনেক রাত কাটিয়েছেন কেঁদে কেঁদে। অনেক খৌজাখুঁজি করেও মা-বাবা ভাইবোনদের আর দেখা পাননি। শূন্যতায় ভরে ওঠে তাঁর হৃদয়-মন। তবে যুক্তজয়ের অদম্য প্রেরণা তাঁকে জীবনের পথে ফিরিয়েছে। জীবনযুক্তে তিনি প্রাণিত হতে চাননি। ফিরে গেছেন ঢাকা ভাসিটিতে। যথাসময়ে ভালো ফলাফল করে ইংরেজিতে মাস্টার্স করেছেন। কথার ফাঁকে জিজেস করলাম,

— বিয়ে করেননি?

মুচকি হেসে বললেন,

— স্বামী পেলাম কই?

রূপা তাঁর রোজগারের টাকা দিয়ে নিজ এলাকায় মেয়েদের স্কুল করেছেন। স্কুলের মেয়েরা সবাই তাঁকে ‘মা-মণি’ বলে ডাকে। রূপার মন আনন্দে ভরে ওঠে। রূপা সাহসী ও সুন্দর জীবন গড়ে তুলতে তাদের সহযোগিতা করেন। রূপার এখন একটাই চাওয়া—আত্মানবতার সেবায় যেন শেষ দিনটি পর্যন্ত নিজেকে বিলিয়ে দিতে পারেন। রূপা তাঁর জীবন-যৌবন সবই দেশমাত্কার মুক্তির লড়াইয়ে সমর্পণ করেছেন। তিনি বীরাঙ্গনা, মুক্তিসেনা।

রূপারা কখনো প্রাণিত হন না। তাঁর মতো লাখো মহীয়সীর শোণিত সিঞ্চ পথে এসেছে এ দেশের স্বাধীনতা। রূপা স্বাধীনতার এক অত্যুজ্জ্বল উপল খণ্ড। বাংলাদেশ যতদিন থাকবে রূপাদের আত্মোৎসর্গের কথা ইতিহাসে ততদিন দেদীপ্যমান থাকবে।

রূপা রূপশ্রী। স্বাধীনতার গর্বিত সৈনিক। তাঁর জীবনকাহিনী শুনতে শুনতে সকাল হয়ে গেল। দিনের আলোয় উজ্জ্বাসিত হলো সবুজ প্রকৃতি। ছাইসেল বাজিয়ে তীব্র গতিতে ট্রেন ধেয়ে চলেছে গন্তব্যের দিকে। অপলক নেত্রে তাকিয়ে থাকলাম আলোকিতা এই মায়ের দিকে। কেটে গেল যাত্রাপথের সুদীর্ঘ সময়। একসময় গাড়ি এসে থামলো চট্টগ্রাম রেলওয়ে স্টেশনের প্ল্যাটফরমে। এক সাথে গাড়ি থেকে নামলাম। সাদা বড় জিপগাড়িতে উঠলেন রূপশ্রী। মুচকি হেসে হাত নেড়ে বললেন, ‘ডেস্ট্র সাহেব, যাই। হয়তো আবার দেখা হবে’।

শহরের প্রশস্ত রাস্তা ধরে অদৃশ্য হয়ে গেলেন মুক্তিযুক্ত ও জীবনযুক্তে জয়ী মহীয়সী নারী রূপা।

## কমলা আজও কাঁদে



বলাইঁচাঁদের ত্রী কমলার পেটব্যথার অশ্রুজলসিঙ্গ কাহিনী নিশ্চয়ই আপনাদের মনে আছে। দেখতে দেখতে কেটে গেল অনেকগুলো বছর। সেই সব দিনের কথা মনে পড়লে আজও ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে বলাইঁ'র বুক, আবেগে জড়িয়ে ধরে কমলাকে। কমলা ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে যেন এমনটি আর কারো না হয়।

বলাইঁদের বাড়ির অদূরে বড় পুকুর, শান বাঁধানো ঘাট। বিকেলে পুকুর ঘাটে জমে ওঠে এলাকাবাসীর খোশ-গল্লের আসর। পুকুরের সুশীতল জল, প্রাণ জুড়ানো মৃদু হাওয়া, ঘাটের পাশে তালগাছের ছায়া, মাঝে মাঝে পুকুরে রঞ্জি-কাতলার লেজের ঝুপঝাপ শব্দ আসরের অনেকের মন কেড়ে নেয়। পুকুরের পুর্ব-পাড় ঘৰ্ষে বলাইঁচাঁদের বাড়ি। ছুটির দিনে কলসি কাঁখে ঘাটে আসে কমলা।

হয় বোনের পর সৎসারে বলাইঁচাঁদের আগমন। মা-বাবার বুক যেন পূর্ণিমার চাঁদের আলোয় উত্তাসিত হলো। অনেক পয়সা খরচ করে ঘষ্টী করে তার নাম রাখল চাঁদ। মামার বাড়ির আত্মীয়রা এ নামের আগে যোগ করে দেয় 'বলাই'। সেই থেকে তার নাম হলো বলাইঁচাঁদ।

বলাইঁচাঁদ পড়ুয়া ছেলে। ভালো নম্বর পেয়ে প্রথম প্রচেষ্টায় এসএসসি পাস করেছিল। ঐ বছরেই যক্ষ্মায় মারা গেলেন বাবা। বছর কয়েক পর দীর্ঘ জুরে ভুগে স্বামীর পথ ধরলেন বুড়ো মা। হয় বোনের এক ভাই বলাই। সবার ছোট হয়েও পড়াশোনা ছাড়তে হলো সৎসারের ঘানি টানতে। চাকরি নিল শহরে রঞ্জনীকান্তের

শারোৎস ফ্যান্টেরিতে। একে একে ছয় বোনের বিয়ে দিয়ে বলাইটাদ ঘরে তুলল  
মুল্লী কমলাকে। কমলা একই ফ্যান্টেরিতে কাজ করে। ভাব করেই তাদের বিয়ে।  
বিমোচে শারোৎসের একশ লোককে মাছে-ভাতে নিমন্ত্রণ থাইয়েছিল। ভালোই চলছিল  
মুল্লী কমলার সংসার। খুরে গেল বছর।

রোজ হাত ধরে খুব ভোরে কাজে যায়। ওভার টাইম করে গভীর রাতে বাড়ি  
ফেরে। এ যেন নিত্যদিনের অভ্যেস। প্রতি মাসে দু-চার পয়সা সঞ্চয় করে  
কানিশাতের দিনগুলোর জন্যে।

১১- দশেক থেকে কমলার শরীর খুব ভালো যাচ্ছিল না। গায়ের জুবটা বেড়ে  
একশ দু-তিন হলো। খাবারে ঝুঁঠি নেই। খানিক পরিশ্রমে খুব ক্লান্ত হয়ে পড়ে।  
শারোৎসটামল ট্যাবলেট খেয়ে খেয়ে জুর সারাতে চেষ্টা করেছে। এখন ওভার টাইম  
কানে পারে না। কোম্পানির ডা. সাহেবকে একশ টাকা বকশিশ দিয়ে তিনি দিনের  
কান নিয়েছে।

সেদিন সকালবেলা। বলাই কাজে যাবে। কমলা হঠাতে খুব ব্যথা  
অন্ধুরণ করল। পান-সুপারি হাতে বসে পড়ল মেবোতে। বলাই কিংকর্তব্যবিমৃঢ়।  
তানে মুহূর্তের জন্যে। নিজেকে সামলে নিল দ্রুত। সংসার আর কর্তব্যের ভার বয়ে  
লয়ে সে বেশ শক্তপোক হয়েছে- যেন খাঁটি লোহা। ভাবল গত রাতের মহাজন  
শাড়ির নিমন্ত্রণের গুরুপাক ভোজ কমলাকে কঢ়ে ফেলল। শানিকটা সৈক্ষণ্য লবণ  
আব দু'চার টুকরো আদাকুঁচি থাইয়ে দিল কমলাকে। জিজ্ঞেস করল, কেমন  
লাগছে? স্বামীর ত্বরিত চিকিৎসায় সে সুস্থ না হয়ে কি পারে!

বলাইটাদ বুঝতে পারল না কমলার কিছুই ভালো লাগছিল না। অনেকটা  
অনিচ্ছাসন্ত্রেণ ঐদিন কাজে গেল বলাই। দুপুর হতে না হতেই কমলার চিন্তায় বাড়ি  
ফিরল। কমলা ততক্ষণে প্রচও পেটের ব্যথায় কাতরাচ্ছে।

বাড়ির অদূরে ওষুধের দোকানে চেম্বার বসিয়ে ডাক্তারি করেন রমণী বাবু।  
গ্রামের এলএমএফ ডাক্তার সুকোমল বাবুর অধীনে বাবো বছর কম্পাউন্ডারি করে  
অনেক কিছুই রপ্ত করেছেন উনি। সুকোমল বাবুর মহাপ্রয়াণে সব নাম যশ এখন  
উনার। সবাই বলে চিকিৎসায় তাঁর হাত খুব পাতলা। রমণী বাবু সম্পর্কে বলাই'র  
কাকা। এসএসসিতে তার পাশের খবর শুনে খুশি হয়ে বাড়িসুন্দ সবাইকে মিটি  
থাইয়েছিল। সবাইকে বলে বেড়াত, ভাইপো তার অনেক বড় কেউকেটা হবে। তবে  
সে আশায় গুঁড়ে বালি। অকালে সংসারে চালকের আসনে বসতে হলো বলাইকে।  
কাকার অন্তরের বাসনা বাস্তবের মুখ দেখল না।

কমলার শারীরিক অবস্থার আরো অবনতি ঘটল। পেট ফুলে গেল, শিরা  
দ্রুততর হলো। কালবিলম্ব না করে বলাই কমলাকে রিকশা করে নিয়ে এল ডা.  
রমণী কাকুর চেম্বারে। রমণী কাকু সবকিছু শুনে বুঝতে পারলেন শিগগিরই তাকে  
হাসপাতালে পাঠানো দরকার।

কমলাকে পাঠিয়ে দিলেন অদূরে সদর হাসপাতালে। জরুরি বিভাগে কমলার দুমাসের বাচ্চার গর্ভপাত হলো। মড়ার ওপর খাড়ার ঘা যেন।

ডাক্তার, বলাইর সাথে আলাপ করে জানতে পারলেন কমলার দশ-বারো দিন ধরে জুর। খাওয়া-দাওয়া তেমন করতে পারেনি। প্যারাসিটামল খেয়ে খেয়ে জুর কমানোর চেষ্টা করেছে। সপ্তাহের হিসেবে হাত পড়বে বিধায় পাস করা ডাক্তারের পরামর্শ নিতে অনীহা প্রকাশ করেছে। তবে এমন যে হবে তা এতটুকুও ভাবেনি।

এরপর। কমলার জরুরি অপারেশন হলো। মৃত্যুর সাথে প্রায় মাসখানেক পাঞ্জা লড়ে সুস্থ হয়ে উঠল কমলা।

মরতে মরতে বেঁচে গেল কমলা। স্বামী-স্ত্রী তা আজও ভুলতে পারেনি। মাঝে মাঝে সে কথা মনে পড়লে কেঁদে ফেলে কমলা। ভাবে সবই অদৃষ্টের লিখন। না হয় এমনটি ঘটবে কেন?

কমলা টাইফয়েড জুরে ভুগছিল। টাইফয়েড, আমাদের দেশে জুরের একটা অন্যতম কারণ। এটা পানিবাহিত রোগ। জীবাণুর নাম সালমোনিলা টাইফি। জীবাণু দ্বারা দৃষ্টিত খাদ্য ও পানীয় গ্রহণে টাইফয়েড জুর হয়। আমাদের দেশে বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে অধিকাংশ মানুষ পুরুষ, ডোবা, নদী, খোলা কৃপ ইত্যাদির পানিতে বাসন-কোসন ধোয়। রান্নাবান্নায় ও পানীয় জল হিসেবে তা ব্যবহার করে থাকে। এ পানি সালমোনিলা টাইফি এবং অন্যান্য জীবাণু দ্বারা দৃষ্টিত হতে পারে। ফলে টাইফয়েডসহ অন্যান্য পানিবাহিত রোগে আক্রান্ত হয়। এসবের পানি ব্যবহারের আগে অবশ্যই তা অনেকক্ষণ ফুটিয়ে ফিল্টার করে নিতে হবে। বিশেষ পদ্ধতিতে জীবাণুমুক্তকরণ প্রক্রিয়ায় তৈরি বিশেষ পানি ব্যবহার অনেক নিরাপদ। তা ছাড়া গভীর নলকৃপের পানিও অনেক নিরাপদ। খাদ্য গ্রহণের আগে অবশ্যই ভালোভাবে সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে নিতে হবে।

কমলা এসব নিয়ম যথাযথ ভাবে পালন করেনি। তাই সে টাইফয়েড জুরে আক্রান্ত হয়েছে।

টাইফয়েড হলে শুরুতে গায়ে গায়ে জুর, খাদ্যে অরুচি ও দুর্বলভাব অনুভব হয়। ক্রমে জুর বাঢ়তে থাকে। শরীর ভালো লাগে না। প্রথমদিকে কোষ্ঠকাঠিন্য হয়। আট-দশদিনের মাথায় পাতলা পায়খানা হয় ও পেট ফেঁপে যায়। অনেকেই তা ভাইরাসজনিত জুর ভেবে প্যারাসিটামল ট্যাবলেট সেবন করে ভালো হওয়ার চেষ্টা করেন। অনেকে আবার আর্থিক সমস্যার কারণে ডাক্তার দেখাতে পারেন না। ফলে বিভিন্ন জটিল সমস্যার সৃষ্টি হয়। এক সময় অন্ত থেকে প্রচুর রক্তক্ষরণ হয় ও অন্ত ফুটো হয়ে যায়। এসবই জীবন-বুঁকিপূর্ণ সমস্যা। এ ধরনের সমস্যা হলে কালো পাতলা পায়খানা হয় ও পেটে হঠাৎ অনেক বেশি ব্যথা অনুভূত হয়। এ অবস্থা হলে রোগীকে অবশ্যই জরুরি ভিত্তিতে হাসপাতালে ভর্তি করিয়ে যথাযথ চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে। যত তাড়াতাড়ি এসব জটিল সমস্যা নির্ণয় করে ব্যবস্থা নেয়া যায়, চিকিৎসায় সুফলও তত বেশি।

কমলান রোগ যথাসময়ে নির্ণয় হয়নি। নিজেদের অবহেলা, অজ্ঞতা ও আর্থিক সমস্যার এন কারণ। অনেক সময় জুরের অত্যধিক তাপমাত্রার কারণে গর্ভপাত হয়। কমলান ফ্রেতে হয়তো তা-ই ঘটেছিল। কিন্তু টাইফয়েড-সংক্রান্ত জটিলতার চিকিৎসা সময়মতো হওয়াতে অনেক কষ্ট পেয়েও সে প্রাণে বেঁচে গেল। খরচ হয়েছিল প্রচুর। সম্ময়ের তহবিল শৃঙ্খলা হয়ে গেছে প্রায়।

এন, সচরাচর পরিলক্ষিত হয় এমন একটি শারীরিক সমস্যা। জেনে রাখা ভালো, আমাদের দেশে যেসব কারণে জুর হয় ভাইরাসজনিত জুর, ম্যালেরিয়া, টাইফয়েড, শ্বাসতন্ত্র ও মৃত্যুভ্রের ইনফেকশন এদের অন্যতম। জুর হলে ন্যূনতম চিকিৎসা যেমন: প্যারাসিটামল ট্যাবলেট সেবন, প্রচুর বিশ্রাম ইত্যাদিতে তিন-চার দিনে জুর না সারলে অবশ্যই অভিজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। জুরের সাথে ইতিহাস জেনে প্রয়োজনে রক্ত, প্রস্রাব ও বুকের এক্স-রে করিয়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রে জুরের কারণ নিরূপণ করা সম্ভব।

ম্যালেরিয়ার প্রকোপ আমাদের দেশের পাহাড়ি অঞ্চলে বেশি। টাইফয়েড সমতলভূমিতে বিশেষ করে গ্রামাঞ্চল ও বন্দি-এলাকায় বেশি। গ্রীষ্মে টাইফয়েডের লকেশন বেড়ে যায়। টাইফয়েড সংক্রান্ত ব্যাধি বিধায় রোগীর মলমৃত্র ফিনাইল ছিটিয়ে বাঢ়ি থেকে বেশ দূরে গর্ত করে পুঁতে রাখা ভালো। ব্যবহারের জলাশয়ে টাইফয়েড আক্রান্ত রোগীর কাপড়-চোপড় ধোয়া ও মলমৃত্র ফেলা কোনোভাবেই উচিত নয়। এতে এলাকায় টাইফয়েড মহামারী আকারে দেখা দিতে পারে।

উপন্নত এলাকার লোকদের অবশ্যই টাইফয়েডের প্রতিয়ে টিকা নেয়া দরকার। টাইফয়েডের চিকিৎসায় বর্তমানে অনেক ধরনের কার্যকর ওষুধ আবিষ্কৃত হয়েছে। তবে যথাসময়ে এ রোগ নির্ণয় করতে হবে এবং এসব ওষুধ কখন, কত দিন ও কী পরিমাণে সেবন করতে হবে সে ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ অহণ করতে হবে।

কমলা নিজেই নিজের চিকিৎসা করেছে। সময়মতো ও যথাযথভাবে ওষুধ সেবন করেনি। দাঙ্গি এবং বাস্তুসচেতনতার অভাব তার স্বাধিকৃত ওলটপালট করে দেয়। অনেক জটিল অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়েছে তাকে। সঞ্চিত অর্থ ব্যয় করে, মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ে অবশেষে প্রাণে বেঁচে গেছে সে। এসব দুঃখের কথা মনে পড়লে আজও স্বামী-স্ত্রী অশ্রুজলে সিক্ত হয়। সময় পেলেই পাড়ার লোকদের তার কষ্টের কাহিনী শুনিয়ে বেড়ায় এবং এ রোগের মারাত্মক পরিণতি সম্পর্কে সবাইকে সতর্ক করে দেয়। ফ্যাট্টি-মালিক রজনীবাবু তার কষ্টের কথা জানতে পেরেছিলেন। কর্মচারীদের কষ্ট লাঘবে রজনীবাবু তাদের ক্যান্টিনে দুপুরের খাবার ও নিরাপদ পানীয় জলের ব্যবস্থা করে সবার শ্রদ্ধাভাজন হয়েছেন।

কমলার কোলজুড়ে এসেছে এক সোনার চাঁদ। ছয় বছর আগের সেই বেদনাময় স্মৃতি মনে পড়লে তাকে চুমু খায় আর কাঁদে।

## তমা জীবন হারাতে বসেছিল



পুরোনো সাদা গাড়িটা নিয়ে রওয়ানা হলাম দেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের পাহাড়ি এলাকার উদ্দেশে। খুব ভোরে যাত্রা শুরু করেছিলাম। গন্তব্যস্থল রূপবর্তী পাহাড়ি জনপদ বান্দরবান। দেশের দক্ষিণাঞ্চলের সড়কপথ অপেক্ষাকৃত ভালো। তবে বিভিন্ন স্থানে সড়কের দু ধারে স্থাপিত হাট-বাজার সড়কপথকে সংকীর্ণ করাতে ঐ সব জায়গা দিয়ে পার হতে বেশ কষ্ট পেতে হয়েছে। কোথাও কোথাও রাস্তার দু ধারে যত্রতত্র রাখা রিকশা, সিএনজি ট্যাক্সি, পুরোনো ছোট বাসগুলো অথবা পথঘাটাকে কষ্টকর করে তুলেছে। তবে ড্রাইভার ও তিনি বন্দুর পুরোনো দিনের খোশগল্লে পথের সময়টা ভালোই কেটেছে। প্রধান সড়ক থেকে পাহাড়ি পথে ঢুকতেই বাংলাদেশ বর্ডার ফোর্সের লোকরা গাড়ি থামিয়ে জিজ্ঞেস করলেন,

- কোথায় যাবেন স্যার? কেন যাবেন?
- রাজবাড়িতে। দাওয়াত আছে।
- কোনো পরিচয়পত্র?

পকেট থেকে নিজের ভিজিটিং কার্ড ও কর্মরত প্রতিষ্ঠানের পরিচয়পত্র বের করে দেখালাম। হাসিমুখে আমাদের যাবার অনুমতি দেয়া হলো। চেকপোস্ট পার হয়ে আঁকাৰ্বাকা সরু পাহাড়ি পথে সতর্কতার সাথে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলতে লাগল গাড়ি। আমাদের ড্রাইভার বেশ তাগড়া এবং পটু। তবে পাহাড়ি পথে গাড়ি

মুশানোন অভিজ্ঞতা তার তেমন নেই। আমাদের বেশ ডয় হচ্ছিল। গাড়ির জানালা খুলে নাটরে দেখলাম। চারদিকে শুধু পাহাড় আর পাহাড়। মুহূর্তেই বুনো ফুলের মাথাল হাওয়া হৃদয় জুড়িয়ে দিল। অনেক নিচে কিছু জায়গায় বড় জলাশয়। পাহাড়ের গা ঘেঁষে পাহাড়ি-বাঙালি আর আদিবাসীদের গাছের তৈরি সারি সারি ঘর-গাঁড়। যেন পাহাড়ি-বাঙালির সৌহার্দের মেলবন্ধন। পাহাড়ি মেয়েরা পিঠে বাচ্চা নেমে মাথায় সবজির খাচা নিয়ে রাস্তার ধার ধরে এগিয়ে চলছে। দু-একটা শান্তিমানী বাস আমাদের গাড়ির পাশ ঘেঁষে বিপরীত দিকে চলে গেল। মনজুড়ে ডয় আব উৎসুক্য।

সকাল দশটায় গাড়ি এসে নির্ধারিত হোটেলের সামনে থামল। ওখানে গাধবাড়ির একটা পুরোনো পাজেরো জিপ নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন রাজপুত। আমাদের দেখে খুশি হয়ে বললেন,

- নমস্কার, ভাক্তার বাবু। আসুন আসুন! আপনাদের অপেক্ষায় আছি।
- নমস্কার। প্রত্যুত্তর দিলাম।

এবার অনেকটা স্পষ্টি বোধ করলাম।

গাড়ি থেকে নেমে সোজা চলে গেলাম হোটেল কক্ষে। রুমগুলো মোটামুটি সাজানো-গোছানো, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। দখিনের জানালার সাথে লাগোয়া পেঁপে গাছে আধাপাকা অনেকগুলো পেঁপে ঝুলে আছে। ভারি সুন্দর দেখাচ্ছিল। হাতমুখ ধূয়ে নাশতার টেবিলে বসলাম। দেশি মুরগির ভুনা, সবজি আর গরম পরোটা। ম্যানু বেশ ভালোই। স্বাদের অশংসা করার অবকাশ নেই। মুরগির মাংস আর আমাদের দাঁত যেন পাল্লা দিয়েই চলছিল। কোনো রকমে একটা পরোটা চিরুতে পারলাম।

- স্যার, কফি নাকি গরম চা?
- হট অ্যান্ড ব্র্যাক কফিই দিন।

গরম ব্র্যাক কফির মন-মাতানো স্বাদ আর গন্ধ আমাদের নিমেষেই সজীব করে তুললো। খানিকটা বিশ্রাম নিয়ে বের হওয়ার প্রস্তুতি নিলাম।

- স্যার, আপনাদের গাড়ি এখানেই থাক। এই পথে আপনার ড্রাইভার গাড়ি ড্রাইভ করলে তা খুব নিরাপদ হবে না। আমাদেরটায় বসুন।

- বেশ তো।

সারাদিন এদিক-সেদিক অনেক সুন্দর জায়গা ঘুরে ঘুরে দেখলাম। দুপুরে আহারের সময়-সুযোগ হলো না। সঞ্চ্যা নামতেই কাছের এক রেস্তোরাঁয় রাস্তা সেরে বের হয়ে পড়লাম। পাহাড়ি সরু পথ ধরে পুরেনো পাজেরো গাড়িটা বেশ চলছিল। হঠাত শুরু হলো ভারী বর্ষণ। ইটের রাস্তাটা পিছিল হয়ে গেল। একে অপরের হাত ধরে পাহাড়ের এক উচু চূড়ায় উঠলাম। ওখানে বৌক ধর্মাবলম্বীদের বড় উপাসনালয়। কয়েকজন বৌকভিক্ষু গভীর উপাসনায় মগ্ন। মন্ত্রমুক্তির মতো চারপাশ

ঘুরে ঘুরে দেখলাম। বৌদ্ধ ক্যাং-এর চোখ জুড়ানো স্থাপত্যশিল্পী নিমেষেই আমাদের মুক্তি করল। বৌদ্ধ সংস্কৃতির ঐতিহ্যের সাথে প্রাচ্য-স্থাপত্যের মিশেলে নির্মিত নান্দনিক সৌকর্যে উৎকীর্ণ এই ধর্ম-মন্দির আমাদের হৃদয়-মনকে অবিভূত করল। এই বৌদ্ধ-মন্দিরের বাতাবরণ শান্ত, শুভ-সমাহিত। এমন মনোহর উপাসনালয় আগে আর কখনো দেখিনি। সাধনার এক মনোমুক্তকর, দৃষ্টিনন্দন উভয় পীঠস্থান বটে! পরিণত বয়সের এক ভিক্ষু এসে আমাদের বৌদ্ধধর্ম ও এর ইতিহাস সম্বন্ধে জ্ঞানদান করলেন। উপাসনালয়ে ততক্ষণে উপাসনার পালা শেষ। আমাদের তাজা ফল, বিশ্বিট, ঠাণ্ডা পানীয় দিয়ে আপ্যায়ন করা হলো। মন্দিরে চুকে আসন পেতে বৌদ্ধমূর্তির সামনেই বসে পড়লাম। প্রধান ভিক্ষু বললেন, ‘জানেন, মহামতি গৌতমবুদ্ধ আবার ধরাধামে আসবেন’। অনেক অংক কষে যা বললেন তাতে বুঝলাম, লক্ষ বছর পর বুঝের আগমন খবরি বাজবে।

‘যখন মানুষ মানুষকে সহ্য করতে পারবে না, অকারণে একে অপবক্তৃত্যা করবে, সবাই ধৰ্মসংবন্ধে মেতে উঠবে তখন ভগবান বুদ্ধ এসে মানব সভ্যতাকে রক্ষা করবেন’—বৌদ্ধভিক্ষুর অভিমত।

অনেক আলাপ হলো এই বৌদ্ধভিক্ষুর সাথে। ঘড়ির কাঁটা রাত ১০টার ঘরে।

বৃষ্টি থামলে ফিরে আসি রাজবাড়ি। কাঠের তৈরি একতলা সুন্দর বাড়ি। সবকিছু সাজানো-গোছানো। দেয়ালের এক জায়গায় রাজ-রানির দৃষ্টিনন্দন ছবি শোভা পাচ্ছিল। রানিমাতা বৃক্ষ। বয়স অন্তত আশি হবে। বছর দশেক আগে রানিমাতাকে অপারেশন করেছিলাম। বৃহদঙ্গে টিউমার হয়েছিল। সেরে উঠেছেন। কৃতজ্ঞতাভরে রাজপুত্র আর রানিমাতা বেশ অনুরোধ করেছেন রাজবাড়ির অতিথি হতে। আজকাল করতে করতে দশ-দশটা বছর কেটে গেল। অবশ্যে রাজবাড়ির অতিথি হলাম। রানিমাতাকে সুস্থ দেখে খুব ভালো লাগল। আমাদের নিয়ে গেলেন রাজবাড়ির উপাসনালয়ে। কানে কানে বললেন ‘ডাক্তার বাবু। তোকে ছেলে জানি। তাই না বলে পারছি না! এ ঘরের এক জায়গায় ছোট এক কাঠের তৈরি বাঁকে সাদা পাথরের বুক আছে। তাকে বুকে নিয়ে তোর ইচ্ছের কথা বলে দিস। মনোবাসনা পূর্ণ হবে’। বেশ কৌতুহল হলো।

— ডাক্তার বাবু হাত-পা ধুয়ে নতুন পোশাকে চুকতে হবে।

— নতুন কাপড় পাই কই রানিমাতা?

রানিমাতা সবই লক্ষ করলেন।

— পুত্র, এই নে নতুন কাপড়।

একটা মোটা তাঁতে বোনা কালো আর সোনালি সুতোর লুঙ্গি ও খড়েরের সাদা গেঞ্জি উপহার দিলেন। নতুন কাপড় পরে ভক্তিপূর্ণ চিঠ্ঠে উপাসনালয়ে প্রবেশ করলাম। সুগন্ধি আগরবাতি ও বড় মোমের বাতি জুলছিল। নকশা করা কাঠের বাঁকে ছোট সাদা একটা বুকমূর্তি। আবেগে, শ্রদ্ধায়, ভক্তিভরে তাকে বুকে নিয়ে প্রার্থনা করলাম, ‘সর্বক্ষেত্রে প্রশান্তি দাও, সমৃদ্ধি আনো, হে ভগবান বুদ্ধ’।

মাধ্যমিক প্রার্থনা শেষে প্রশান্তির হোয়া নিয়ে বের হয়ে রানিমাতার পাশে বসে পাখুলাম। রানিমাতা রাজবাড়ির গঞ্জ জুড়ে দিলেন।

শান্তা চট্টগ্রাম ৫,০৯৩ মাইলজুড়ে বিস্তৃত, যা দেশের প্রায় দশ শতাংশ। কোনো কোন স্থানে তা প্রায় ৪,৫০০ ফুট উচু। দশ ধরনের মঙ্গোলিয়ান বংশজাত উপস্থান এখানে বাস করে। পার্বত্য চট্টগ্রাম তিনটি সার্কেলে বিভক্ত। তাঁদের বংশ নামাং রাজবংশ নামে পরিচিত। ১৮০৪ সালে হলা প্রথ বান্দরবান গড়ে তোলেন। এন আগে তা ওয়াদয়-মরো নামে পরিচিত ছিল। বর্তমানে রাজা নির্ধারণ করা হয় নামপংশের পছন্দ অনুসারে।

শান্ত অনেক হলো। সবাই বেশ ঝান্ত এবং কুধার্ত।

সুস্থানু খাবারের সুগক্ষে ভরে গেছে পুরো ঘর। একটা কাবুকার্যখচিত টেবিলে নামার খাবারের পসরা সাজানো। পাহাড়ি, বাঙালি হরেক রকম খাদ্যের মামারোহ। মহাত্মার তোজনপর্ব সারলাম। ছবি তোলার পর্বও শেষ হলো। পরে রানিমাতা বিনয়ের সুরে বললেন, ‘বাবা আমার এক নিকট-কুটুম্ব তিন-চারদিন ধরে খুন পেট ব্যথায় ভুগছে। ওকে দেখলে কৃতজ্ঞ থাকব।’

তিন তিনটে উঠোনের পর কুটুম্বের ঘর। রাজপুত্রের সাথে রোগীর ঘরে প্রবেশ করলাম। বিছানায় শয়ে আছেন রানিমাতার কুটুম্ব। দুপাশে চারজন পাহাড়ি মহিলা নিসে আছেন, হাতপাথা দিয়ে বাতাস করছেন। ডান পাশে ছোট একটা বসার চৌকি। তাতে আমাকে বসার অনুরোধ করল। চৌকিটাও বেশ শক্ত কাঠের। সুন্দর নকশা করা। উপরে নরম তুলতুলে আচ্ছাদন। চারদিক এক-পলকে দেখে নিলাম। দরজার ফাঁক দিয়ে শিশুরা উকি মেরে দেখছিল। ওরা এর আগে বাঙালি দেখেছে কিনা জানি না। ফিসফিস করে কিছু একটা আলাপ করছিল নিজেদের মধ্যে। ওদের ভাষা ভিন্ন। কিছুই বুঝতে পারলাম না। হয়তো বলছে, ‘শহরের বড় ডাক্তার। এবার আর মার কষ্ট থাকবে না। কিন্তু ওদের কাছে কোনো ওযুধপত্র নেই। শুধু গলায় একটা বিশেষ পাইপ। রোগ সারবে কেমনে।’ আশেপাশের মেয়েরা দূরে সরে পড়ল। সবাই যুবতী। উর্ধ্বাঙ্গ-নিম্নাঙ্গে লেপটে থাকা পোশাকগুলো যৌবনের মহিমা কীর্তন করছিল। পাশেই রাজপুত্র। অনতি দূরে দাঁড়িয়ে রানিমাতা সবকিছু মনোযোগ সহকারে অবলোকন করছেন। পাশে গিয়ে জিজেস করলাম, ‘কী কষ্ট বলুন তো?’

রোগী মাঝে মাঝে বড় বড় চিংকার করে যা বলছিলেন, তার অর্থ, ‘ওরা আমার নাড়ি-ভুঁড়ি খেয়ে ফেলল, আমার কলিজা খেয়ে নিল। বড় একটা দা এনে পেট কেটে ওদের বের করে টুকরো টুকরো করে মেরে ফেল।’ বুঝতেই পারলাম তার পেটে খুব ব্যথা হচ্ছে। থেমে থেমে ব্যথা তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছিল। নাম জিজেস করলাম। তমা। বয়স পঁচিশ-ছাবিশ হবে। বিবাহিত। ছেলেমেয়ে তিনজন। বড়জনের বয়স সাত-আট। ওরাই সম্ভবত দরজার ফাঁক দিয়ে উকি দিচ্ছিল। মায়ের কষ্টে ওদেরও মন ভালো নেই। মুখ ফ্যাকাসে, চোখগুলো বেশ ফেলা ফেলা।

তমার পাশে গিয়ে বসলাম। জিজ্ঞেস করলাম, 'কখন থেকে ব্যথা, কী রকম ব্যথা। কী কী চিকিৎসা নিয়েছেন'।

তমা অষ্টম শ্রেণী অবধি লেখাপড়া করেছেন। বাংলা বোঝেন, বলতেও পারেন। কিছু কিছু ইংরেজিও জানেন। তিনি দিন আগে রাতে খাওয়ার পর হঠাতে পেটের উপরিভাগে বেশ ব্যথা শুরু হয়। ব্যথা ক্রমে বুকের দিকে ছড়িয়ে পড়ল। মাঝে মাঝে এমনটি হয় যেন কলজেটা কামড়ে থেয়ে নিচ্ছে।

তমার বড় ভাই ডাক্তারি শাস্ত্র চর্চা করেন। ট্যাবলেট, ক্যাপসুল ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকার ঔষুধ প্রয়োগ করেছেন। ব্যথা কমেনি। পাহাড়ি বৈদ্যরাও এসে অনেকবার বাড়ি-ফুঁক করে গেছেন। বনের সতাপাতা পিষে পেস্ট করে প্রলেপ দিয়েছেন নাভির উপর। কিছুতেই কিছু হলো না। তিনিই ধরে খাওয়া-দাওয়া বন্ধ। বড় ভাই হাতে স্যালাইন দিয়েছেন। তাতে তমার জানটা যেন বেঁচে আছে। সবকিছু জিজ্ঞাসা করে তাকে তাৎক্ষণিক পরীক্ষা করলাম। বললাম, 'সামান্য কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষার দরকার হবে। তবেই রোগ নিরূপণ করা সহজ হবে'।

কাছেই বেসরকারি একটা ক্লিনিকের স্যাটেলাইট ল্যাবরেটরি সেন্টার। তমার বড়ভাই ঐ ল্যাবরেটরিতে কাজ করেন। তমাকে ওখানে নেয়া হলো। তারপর, যা আবিষ্কৃত হলো তাতে সবাই হতবাক। ঐদিনই তাকে চট্টগ্রামের বড় একটা হাসপাতালে নিয়ে আসি। বিশেষ এক ঘন্টার সাহায্যে তার পিস্তনালি থেকে চার ঢাকটা বেশি বড় গোল কূমি বের করা হলো। পেট ব্যথা সেরে গেল। তমা যেন নতুন জীবন ফিরে পেল।

তমার যে অসুখ হয়েছিল সে বিষয়ে অনেকের তেমন বিশেষ ধারণা নেই। তাই এ রোগ সম্বন্ধে খানিকটা আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে। তমার পিস্তনালিতে গোল কূমি চুকেছিল। আগেই বিভিন্ন ধরনের কূমি সম্বন্ধে কিছুটা আলোকপাত করা হয়েছে। গোল কূমির জীবনচক্র সম্বন্ধেও আলোচনা করা হয়েছে। গোল কূমি মানব দেহে যে যে রোগব্যাধি ঘটায় তার একটা সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা করা হয়েছে। গোলকূমি পিস্তনালিতে কিংবা পিস্তনালিতে ঢোকার ফলে মারাত্মক পিস্তশূল ও ঘৃতক্রতের বিভিন্ন সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে। এ সম্বন্ধে খানিকটা আলোচনা করা দরকার।

গোল কূমি সাধারণত কুদ্রাত্ত্বের শেবভাগে ও বৃহদ্বৰ্ষে অবস্থান করে। অনেক সময় এরা অঙ্গের বেশ উপরিভাগে চলে আসে এমনকি বমির সাথে বের হয়। ডিওডেনামে ও পাকস্থলীতে এলে পেটের উপরিভাগে ব্যথা হয়। বমির ভাব হয়। অনেক সময় বমি হয়। আবার অনেক সময় বমির সাথে গোল কূমি বের হয়। সব বয়সের লোকের এ ধরনের সমস্যা হতে পারে। তবে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে এ সমস্যা অনেক মারাত্মক আকার ধারণ করতে পারে। সাধারণত এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার দেশসমূহে এর প্রকোপ অত্যন্ত বেশি। এশিয়া মহাদেশে মৌসুমি বায়ুপ্রবাহের অঞ্চলসমূহে বিভিন্ন ধরনের কূমির আক্রমণ অপেক্ষাকৃত বেশি।

গোল কৃমি অনেক সময় পিত্তনালির ছিদ্রপথে পিত্তনালিতে চুকে পড়ে এবং উপরের দিকে চলে যায়, পিত্তনালির বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় অবস্থান করে। অনেক সময় এরা পিত্তথলেতে চুকে বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সৃষ্টি করে।

পিত্তথলি বা পিত্তনালিতে অবস্থান করলে পেটে অসহ্য যন্ত্রণা অনুভূত হয়, কাঁপুনি দিয়ে জুর আসে, বমি হয়। ব্যথা অনেক সময় এত তীব্র হয় যে রোগী মনে করে কিসে যেন কামড়ে পেটের উপরের সবকিছু ছিঁড়ে ফেলছে। আবার কখনো মনে হয় কিসে যেন যকৃৎ বা লিভার কামড়ে থাচ্ছে। কৃমির উপস্থিতির ফলে পিত্তথলেতে ইনফেকশন জনিত প্রদাহ হয় ও পিত্তনালি ফুলে যায়। পিত্তনালিতে প্রদাহ হয়, অনেক সময় তাতে পুঁজ জমে। ইনফেকশন ক্রমে উপরে যকৃতে ছড়িয়ে পড়ে। যকৃতের প্রদাহ হয় কিংবা তাতে পুঁজ জমে ফোঁড়া হয়ে যায়। ইনফেকশন রক্তে ছড়িয়ে পড়লে মারাত্মক সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে। এমন অবস্থায় রোগীর অবস্থা বেশ সংকটাপন্ন হয়ে পড়ে। কাঁপুনি দিয়ে বেশ জুর আসে। আহার বন্ধ হয়ে যায়।

দীর্ঘদিন পিত্তনালিতে গোল কৃমি থাকলে তাতে পিত্তনালি সংকুচিত হয়ে যায় এবং জড়িস দেখা দেয়। এ ধরনের রোগ বারবার হতে পারে। ফলে লিভারের জটিল প্রদাহ হয় এবং এক সময় তা নষ্ট হয়ে যায়।

এটি মারাত্মক ধরনের সমস্যা। সুতরাং হঠাতে পেটে অসহ্য যন্ত্রণা হলে এবং তা বুকে পিঠে ছড়িয়ে পড়লে, গায়ে জুর এলে এ ধরনের সমস্যা হয়েছে বলে সন্দেহ করতে হবে। অন্যান্য কিছু রোগ যেমন: পেপটিক আলসারের ব্যথা, পিত্তথলের ও পিত্তনলের পাথরজনিত ব্যথা, অগ্ন্যাশয়ের প্রদাহ, পিত্তথলের প্রদাহ, ডিওডেনাম কিংবা পাকস্থলীর ঘা ফুটো হয়ে যাওয়া ইত্যাদিতে অনেকটা এই ধরনের যন্ত্রণা হতে পারে। তবে রোগের সঠিক ইতিহাস জেনে ও প্রয়োজনে বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে সঠিক রোগটি নিরূপণ করা সম্ভব।

পিত্তথলের কিংবা পিত্তনালিতে গোল কৃমি ঢকেছে, এমনটি সন্দেহ হলে আলট্রাসনোগ্রাফি পরীক্ষার সাহায্যে তা সহজে নির্ণয় করা যায়। আর তা নিরূপণ হলে বেদনানাশক ওষুধ, অ্যান্টিবায়োটিক ও পিত্তনালির ছিদ্রপথ প্রসারণের জন্য বিশেষ ধরনের ওষুধ প্রয়োগ করতে হয়। এ ধরনের চিকিৎসা অনেক ক্ষেত্রে বেশ ফলপ্রসূ। এতে অনেক সময় গোল কৃমি আবার অঙ্গে চলে আসে। এ অবস্থায় কৃমি নাশক ওষুধ প্রয়োগ করলে তা মলত্যাগের সময় বের হয়ে আসে।

তবে অনেক সময় এ ধরনের চিকিৎসায়ও তেমন কোনো ফল হয় না এবং অগ্ন্যাশয়ের প্রদাহসহ বিভিন্ন ধরনের জটিলতার সৃষ্টি হয়। এ ক্ষেত্রে ইআরসিপি নামের বিশেষ পদ্ধতিতে পিত্তনালির গোল কৃমি অপসারণ সম্ভব। তবে বিশেষ ক্ষেত্রে অপারেশন করে গোল কৃমি বের করতে হয়। এ ধরনের সমস্যা বারবার হতে পারে এবং একই চিকিৎসা পদ্ধতি অবলম্বন করতে হয়।

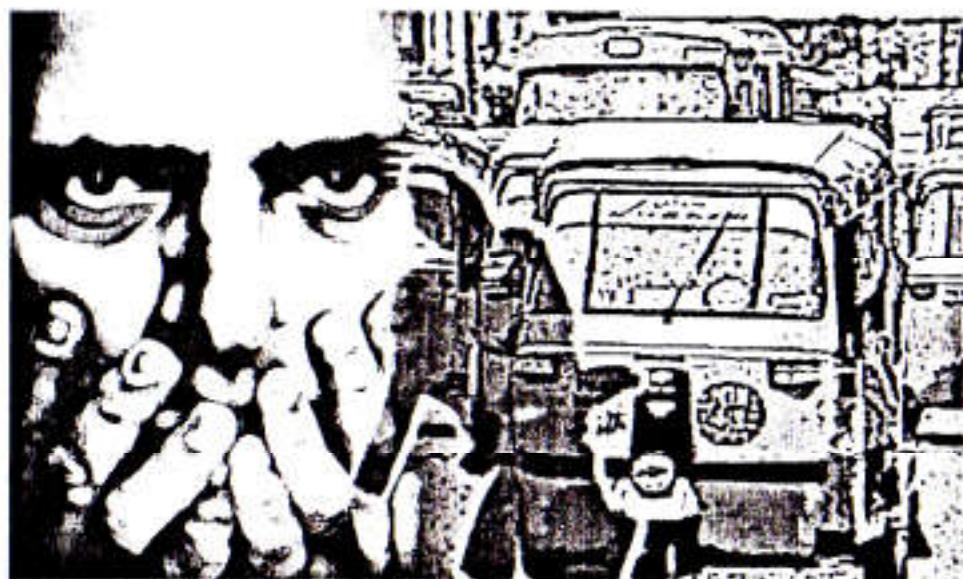
অতএব দেখা যাচ্ছে, গোল কৃমির আক্রমণ একটা সাধারণ রোগ হলেও বিশেষ ক্ষেত্রে তা মারাত্মক পরিণতির সৃষ্টি করে। ফলে মৃত্যুরুকি দেখা দেয়।

দেশের বর্তমান স্বাস্থ্যনীতিতে এ সমস্যাকে যথেষ্ট গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হচ্ছে। বছরের বিভিন্ন সময় সরকারি সংস্থা, বেসরকারি সংগঠন ও ব্যক্তিগত উদ্যোগে কৃমিনাশক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এতে বেশ সুফলও পাওয়া যাচ্ছে। তবে এ ধরনের কার্যক্রম অবশ্যই বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের বিশেষ তত্ত্বাবধানে ও পর্যবেক্ষণে সম্পন্ন করা প্রয়োজন। কোন কৃমিনাশক ওষুধ কার্যকর অথচ পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া কম তা বাচাই করে নিতে হবে। কৃমিনাশক ওষুধ সঠিক মাত্রায় ও সঠিকভাবে প্রয়োগ করা দরকার। কিছু কিছু ক্ষেত্রে ছোটখাটো কিছু সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে। তবে সময়মতো ও সঠিক পদক্ষেপে তা নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব।

বাংলাদেশের প্রায় সব জনপদে গোলকৃমির আক্রমণ খুব বেশি। সমতলভূমিতে স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা অপেক্ষাকৃত ভালো। দেশের পাহাড়ি অঞ্চলে জনপদগুলো অপেক্ষাকৃত অবহেলিত। দুর্গম অঞ্চলে স্বাস্থ্যসেবা খুবই কষ্টসাধ্য ও সীমিত। অথচ অন্যান্য স্বাস্থ্য-সমস্যার মতো কৃমিজনিত সমস্যাও এখানে প্রকট। তাই দেশের পাহাড়ি জনপদেও এ ধরনের কার্যক্রম পরিচালনা করা অত্যাবশ্যিক।

পার হলো কয়েক বছর। পাহাড়ি বন্দুদের আতিথেয়তা আজও বেশ মনে পড়ে। তামার পেট ব্যথার কথা মনে পড়লে হৃদয় ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। আমাদের সময়মতো ও সঠিক পদক্ষেপে তামা পেটের অসহ্য যত্নণা থেকে সে-যাত্রা পরিত্রাণ পেয়েছিল। রাজবাড়ির লোকরা তাই বিন্দুরিচিতে আজও আমাদের প্রেরণ করে এবং সঠিক চিকিৎসার জন্য কৃতজ্ঞতা জানাতে দুরাভাসে খবরাখবর নেয়।

## বড় বাঁচা বেঁচে গেছে ইউনুস



ইউনুস বদ্ধদের নিয়ে প্রায়ই রাত জেগে তাস খেলত। গ্রামের ভাঙা ইটের রাস্তায় রিকশা টেনে দু-চার পয়সা রোজগার করত। তাতে সংসারে নুন আনতে পানতা ফুরানোর অবস্থা। দু-দুটো বৌ সুচিকিৎসার অভাবে গর্ভকালীন সময়ে মারা যায়। গেল বছর সচ্ছল পরিবারের দ্বিতীয় ঘরের বৌকে ঘরে তুলল ইউনুস। আগের দুটো সংসারে ছেলেমেয়ে রয়েছে সাতজন। বছর ঘুরতেই নতুন ঘরে এল এক কন্যাসন্তান। বৌ-বেচারি প্রায়ই বাপের বাড়ি গিয়ে ধান-চাল, টাকা-পয়সা নিয়ে আসত। শুণুর-শাণুড়ি নিয়ে দশ জনের সংসার চলত কোনো রকমে টেনে টুনে। ইউনুস দেখেও দেখে না, বুঝেও বুঝে না। তাসের নেশা যেন তাকে গিলে ফেলেছে। বৌ প্রতিবাদ করলে তাকে মারধর করে। বেচারি কাউকে মুখ ফুটে কিছুই বলে না। মনে মনে কপালের লিখনকেই দায়ী করে। ভাবে একদিন হয়তো সব ঠিক হয়ে যাবে।

সেবার গ্রামে হঠাৎ বন্যা হলো। বন্যা-পরবর্তী সময়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে ডায়রিয়া। এবারও চিকিৎসার অভাবে ছোট এক কন্যাসন্তান রেখে চিরন্দিয়ায় শায়িত হলো তৃতীয় বৌ। দাদা-দাদি খুঁজে-মেগে নাতি-নাতনিদের কোনো রকমে বাঁচিয়ে রাখল।

ইউনুস বলে, বাচ্চা-কাচ্চাদের দেখবে কে? ঘরনী দরকার। অতএব, নতুন ঘরনী আসলো আবার। নাম আয়েশা। বেশ শক্ত মনের মহিলা। ইউনুস আর রাত জেগে তাস খেলতে পারে না। ঠিক সময়ে বাড়ি না ফিরলে আয়েশা খোঁজাখুঁজি করে

ঘরে নিয়ে আসে তাকে। আয়েশা ইউনুসের চতুর্থ বো। সবাই বলে এবার বুঝি ইউনুসের ঘাড় সোজা হলো!

কাটল আরো কয়েকটা বছর। ইউনুস এখন সিএনজি ট্যাক্সি চালায়। ভালো রোজগারপাতি করে। বাচ্চারা এখন বড় হয়েছে। ঘরে এল নতুন হেলেস্টান। আগের ঘরের বড় ছেলে ভালো লেখাপড়া করে। মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পাস করেছে। গ্রামের এক বেসরকারি কলেজে বিনা বেতনে অধ্যয়নের সুযোগ পেয়েছে। সবাই বলে আয়েশা ভাগ্যবতী। সব তারই কৃতিত্ব।

একদিন দুপুর বেলা। ইউনুস সিএনজি চালাচ্ছিল। হঠাৎ পেটে ভীষণ ব্যথা অনুভব করলো। কিছুই আর ভালো লাগছিল না। পথে এক হাসপাতালের সামনে ট্যাক্সি থামিয়ে হাসপাতালের জরুরি বিভাগে ডাক্তারের শরণাপন্ন হলো। ডাক্তার সাহেব সব বুঝে তাকে হাসপাতালে ভর্তি করিয়ে নিলেন।

সঙ্গে সাতটা। ইউনুস সার্জারি ওয়ার্ডে। এখানে ইউনুসকে আগে থেকে অনেকে চেনে। ওয়ার্ডের কর্মচারীদের অনেকেই একই গ্রামের বাসিন্দা। যথারীতি পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর ডা. সাহেব বুঝতে পারলেন ইউনুসের অন্ত ফুটো হয়ে গেছে। ইতিমধ্যে জ্বী, বড় ছেলে ও কয়েকজন আত্মীয়-স্বজন উপস্থিত হলো হাসপাতালে। সবার চোখে-মুখে কালো মেঘের ছায়া। ইউনুসের জরুরি অপারেশন দরকার। হাতে স্যালাইন লাগানো হলো, নাকের ভেতর দিয়ে পাকস্থলীতে টিউব চুকানো হলো। ইউনুসের পেট বেশ ফুলে গেছে, ব্যথায় ছটফট করছে। রাত গভীর হলো। সবার অপেক্ষার বুঝি শেষ নেই। ডাক্তার এসে অঙ্গীকারনামা এগিয়ে দিয়ে বললেন, ‘অপারেশন হবে, সই করুন। রক্ত নিয়ে আসুন। সাথে ওষুধগুলো কিনে আনুন’।

ওষুধ এবং রক্ত জোগাড় হলো। ইউনুসের বুড়ো বাবা অস্পষ্ট অক্ষরে অঙ্গীকার-নামায় সই করলেন। চোখ দিয়ে তার টপটপ করে গড়িয়ে পড়ল জল। ওয়ার্ডবয় এসে ওষুধ আর রক্তের ব্যাগ নিয়ে অপারেশন থিয়েটারে চুকল। হাসপাতালের মসজিদে তখন ফজরের আজানের সুমধুর ধ্বনি।

অপারেশন শেষে ইউনুসকে ওয়ার্ডে নিয়ে আসা হলো।

মাসখানেক মৃত্যুর সাথে পাঞ্চা লড়ে ইউনুস সুস্থ হয়ে ঘরে ফিরল। তবে সে এখন অনেক দুর্বল। মাস দুই পর আবার আগের কাজে ফিরে এল ইউনুস। সবার চোখে-মুখে এখন হাসি। ডাক্তারের পরামর্শে সে আর রাত জাগে না। নিয়মিত আহার ও ওষুধ সেবন করে। বড় ছেলে উচ্চ মাধ্যমিক পাস করেছে। শহরের এক কম্পিউটার সেন্টারে কোর্স করছে। জীবন নিয়ে অনেক স্পন্দন দেখে সে। বাবার কষ্ট লাঘব করার প্রত্যয় তার চোখে-মুখে।

ইউনুস যে রোগে আক্রান্ত হয়েছিল তার নাম পেপটিক আলসার পারফোরেশন অর্থাৎ আলসারের কারণে অন্ত ফুটো হওয়া।

ঠিকনুস খুব অনিয়মে চলত। নিয়মিত আহার করত না, রাত জেগে তাস খেলে। অত্যধিক ধূমপান করত। মদপানও করতো নিয়মিত। ফলে তার ডিওডেনামে আলসারের ‘ঘা’ হয়। অবহেলায় ও অর্থাভাবে ভাঙ্গার দেখাতে শান্তেন। আলসারের ওষুধ নিয়মিত সেবন না করায় আলসার ক্রমশ গভীর থেকে গঠিতাত্ত্ব হয় এবং এক পর্যায়ে ফুটো হয়ে যায়।

পেপটিক আলসার বলতে কী বোঝায়? কেন আলসার ফুটো হয়ে যায়। ১৬ডেনাম, খাদ্যনালি ইত্যাদি বিশেষ জায়গায় বিশেষ এক ধরনের ‘ঘা’ সৃষ্টি হতে পারে, একে আমরা পেপটিক আলসার বলি। পাকস্থলী থেকে অত্যন্ত শক্তিশালী অস্ত্র হাইড্রোক্লোরিক এসিড ও পাচক রস পেপসিন নিঃসৃত হয়। এসর রাসায়নিক পদার্থ শব্দারে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় কাজ সম্পাদন করে। আবার এসব পদার্থ পাকস্থলী ও ১৬ডেনামের শ্রেণিক বিভিন্ন ধৰ্মস করে ক্ষতের সৃষ্টি করতে পারে। প্রাকৃতিক নিয়মেই এ শ্রেণিক বিভিন্ন মিউসিন নামক পদার্থ দ্বারা আবৃত থাকে। এছাড়া হাইড্রোক্লোরিক এসিড ও পেপসিন, খাদ্য ও পানীয় এর সাথে মিশ্রিত হয় বিধায় এদের ক্ষতিকারক ক্ষমতা কমে যায়। ফলে পাকস্থলী ও ডিওডেনামের ভিতরের শ্রেণিক বিভিন্ন অঙ্গত থাকে।

বৈজ্ঞানিকরা বিশেষ পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে আবিষ্কার করেন যে, হেলিকোব্যাক্টের পাইলোরি নামক এক ধরনের বিশেষ জীবাণু পাকস্থলী ও ডিওডেনামের শ্রেণিক বিভিন্ন নিচে অবস্থান করে। বিশেষ পরিস্থিতিতে এরা এক্ষণ বিস্তার করে ও শ্রেণিক বিভিন্ন প্রদাহ সৃষ্টি করে। ক্রমে প্রদাহের জায়গায় হাইড্রোক্লোরিক এসিড ও পেপসিন আঘাত হানে। ফলে ক্ষতের সৃষ্টি হয়। এ ক্ষতস্থানকেই আমরা পেপটিক আলসার বলি। এছাড়া যেসব রোগী দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন ধরনের বাত রোগের ওষুধ যেমন- অ্যাসপিরিন, ক্লোফেনাক জাতীয় ওষুধ সেবন করেন তাদেরও পেপটিক আলসারে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। বিভিন্ন পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে হেলিকোব্যাক্টের পাইলোরি, হাইড্রোক্লোরিক এসিড ও পেপসিন শতকরা নবাই ভাগ ক্ষেত্রে এবং বাতের ওষুধ শতকরা দশভাগ ক্ষেত্রে পেপটিক আলসার রোগ সৃষ্টির জন্য দায়ী। ধূমপান আলসারের ‘ঘা’ সৃষ্টি তুরাবিত করে, এমনকি আলসারের কার্যকর ওষুধ সত্ত্বেও ধূমপায়ীদের আলসারের ‘ঘা’ সহজে শুকায় না।

অতএব বিভিন্ন বাত রোগের ওষুধ সেবনে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার এবং এসব ওষুধের সাথে আলসারের ওষুধ সেবনও একান্ত প্রয়োজন। আলসার রোগীদের অবশ্যই ধূমপান করা উচিত নয়। যারা ধূমপান করেন তাদের শিগগিরই ধূমপান পরিত্যাগ করা উচিত।

পেপটিক আলসার সাধারণত ডিওডেনামের প্রথম অংশ ও পাকস্থলীতে হয়ে থাকে। কিছু রোগীদের আবার খাদ্যনালি ও শুদ্ধাত্ত্বের অন্যান্য স্থানে তা পরিলক্ষিত হয়। পেপটিক আলসারে আক্রান্ত রোগীদের কিছু সাধারণ উপসর্গ দেখা যায়। এসব

উপসর্গ হচ্ছে— বুক জুলাপোড়া করা, পেটের উপরিভাগে ব্যথা হওয়া, পেট জুলাপোড়া করা, বমির ভাব হওয়া, পেট খালি হলে পেট ব্যথা করা, অত্যধিক টক চেকুর ওঠা, খাওয়ার পরে পেট ভারি ভারি মনে হওয়া ইত্যাদি প্রধান। কোনো কোনো রোগীর ক্ষেত্রে বিশেষ ধরনের জটিলতা যেমন— রক্তবমি, অস্ত্র ফুটো হয়ে যাওয়া ইত্যাদি এ রোগের লক্ষণ হতে পারে। যাদের উপরোক্ত উপসর্গগুলো বিদ্যমান তাদের অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ নেয়া দরকার। রোগের সঠিক ইতিহাস ও বিশেষ পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে আলসার রোগ নির্ণয় করা সম্ভব। বিশেষ ধরনের এক্সে ও এনডোসকপির মাধ্যমে এ রোগ নির্ণয় সম্ভব। পাকস্থলী ও ডিওডেনামের এনডোসকপি এ ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এ ঘন্টের সাহায্যে প্রয়োজনে ক্ষতস্থান থেকে টিস্যু নিয়ে পরীক্ষা করা যায়। এতে হেলিকোব্যাস্ট্র পাইলোরির উপস্থিতি নির্ণয় করা সম্ভব। পাকস্থলীর ক্ষতে ক্যাসার আছে কিনা তাও টিস্যু বায়োপ্সি করে নির্ণয় করা যায়। রোগ সঠিকভাবে নির্ণয় করতে পারলে বিভিন্ন ধরনের অত্যন্ত কার্যকরী ওষুধ প্রয়োগের মাধ্যমে আলসার রোগ নিরাময় সম্ভব। তবে বিভিন্ন পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে, হেলিকোব্যাস্ট্র পাইলোরি পুনরায় পাকস্থলী বা ডিওডেনামে জন্মাতে পারে। তাই কয়েক মাস পর পর এনডোসকপি করে হেলিকোব্যাস্ট্র পাইলোরি ও আলসারের উপস্থিতি নির্ণয় করা যেতে পারে এবং প্রয়োজনে পুনরায় আলসারের ওষুধ সেবন করতে হবে।

পাকস্থলী ও ডিওডেনামের প্রদাহ, ডিওডেনামের ডাইভারটিকুলাম, পিন্ডথলের প্রদাহ, পিন্ডথলের পাথর জনিত সমস্যা, অগ্ন্যাশয়ের প্রদাহ, বৃহদত্তের প্রদাহ, পাকস্থলীর ক্যাসার ইত্যাদি রোগেও ঐ ধরনের কিছু কিছু লক্ষণ দেখা যায়। তাই রোগ নির্ণয় করার ক্ষেত্রে বিশেষ সর্তকতা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজন হতে পারে।

ডিওডেনামে ক্যাসার রোগের কথা খুব কমই শোনা যায়। তবে ডিওডেনামের ‘ঘা’ অত্যন্ত গভীর ও বড় হলে ‘ঘা’ থেকে টিস্যু নিয়ে পরীক্ষা করে তার ধরন ও চিকিৎসা পদ্ধতি নির্ণয় করা যেতে পারে।

পাকস্থলীতে ক্যাসার হলে খাদ্য বেশ অরুচি হয়, বমির ভাব বা বমি হয়, শরীর দুর্বল হয়ে পড়ে ও ওজন কমে যায় এবং রক্তস্তন্ত্র দেখা দেয়। সাধারণত চল্লিশোধ্বর বয়সের লোকেরা পাকস্থলীর ক্যাসারের আক্রান্ত হয় বেশি। যদিও এর চেয়ে কম বয়সের লোকের পাকস্থলীতে ক্যাসার হতে পারে। মনে রাখতে হবে, পাকস্থলীর আলসার, দু-তিন কোর্স আলসারের ওষুধ সেবনে ভালো না হলে পুনরায় টিস্যু বায়োপ্সি করতে হবে। অনেকে পাকস্থলীর ক্যাসার রোগকে পেপটিক আলসার মনে করে অনেক দিন ধরে আলসারের ওষুধ সেবন করে। ক্যাসার রোগ এ সময়ে শরীরের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে ও মৃত্যু ত্বরান্বিত করে। তাই পাকস্থলীর ঘা বা আলসারের রোগীদের চিকিৎসায় বিশেষ মনযোগী হতে হবে।

পেপটিক আলসারের সময়মতো ও সঠিকভাবে চিকিৎসা না হলে বিভিন্ন জটিলতার সৃষ্টি হতে পারে। ক্ষমে ঘা অত্যন্ত গভীর হয় ও ঘা থেকে প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়। ফলে রোগীর রক্তবমি হয় ও আলকাতরার মতো কালো পাতলা পায়খানা হয়। রোগীর জীবন সংকটাপন্ন হয়ে পড়ে। এ ধরনের অবস্থার সৃষ্টি হলে অবশ্যই রোগীকে হাসপাতালে ভর্তি করিয়ে জরুরি চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিভিন্ন ওষুধ প্রয়োগে রক্তক্ষরণ বন্ধ হয়ে যায়। বিশেষ কিছু ক্ষেত্রে রক্তক্ষরণ বন্ধ না হলে এনডোসকোপির মাধ্যমে বিশেষ পদ্ধতি প্রয়োগে রক্তক্ষরণ ঘৰ ক্ষয়া ঘায়।

অতএব, পেপটিক আলসারের কোনো রোগীর রক্তবমি হলে বা পায়খানা আলকাতরার মতো কালো ও পাতলা হলে আলসার থেকে রক্তক্ষরণ হচ্ছে এমনটি ধারণা করতে হবে এবং রোগীকে জরুরি ভিত্তিতে হাসপাতালে ভর্তি করে চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে। রক্তক্ষরণ ওষুধ সেবনে বন্ধ না হলে অপারেশনের সাহায্যে কিংবা বিশেষ পদ্ধতি প্রয়োগে তা বন্ধ করতে হয়। সময়মতো সঠিক চিকিৎসা নিশ্চিত করা না হলে মৃত্যুও ঘটতে পারে। বিভিন্ন সমীক্ষায় দেখা গেছে, পেপটিক আলসারের বিভিন্ন জটিলতায় যেসব রোগীর মৃত্যু ঘটে তার শতকরা পঁচিশ ভাগ ঘটে প্রচুর রক্তক্ষরণের ফলে।

কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা ঘায় পেপটিক আলসার দীর্ঘদিন ধরে অবস্থান করলে ও পরে ধীরে ধীরে শুকাতে থাকলে ঐ জায়গা সংকুচিত হয়ে যায় এবং খাদ্য চলাচলের পথ সরু হয়ে যায়। ফলে খাদ্যদ্রব্য পাকস্থলী হতে অন্তে যাওয়ার পথে বাধাপ্রাণ হয়। এ ধরনের সমস্যাকে আমরা পাইলোরিক এসটেনোসিস বলি। সাধাবণত নিয়মিত ও সঠিকভাবে ওষুধ সেবন না করলে এ ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হয়। পাইলোরিক এসটেনোসিস হলে অনেক ক্ষেত্রে অপারেশন করে খাদ্য চলাচলের পথ নতুন করে তৈরি করে দিতে হয়। বিভিন্ন ধরনের অপারেশন করে এ ধরনের নতুন পথ সৃষ্টি করা যেতে পারে। আবার বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বিনা অপারেশনে বিশেষ পদ্ধতিতে খাদ্য চলাচলের পথ পুনরায় খুলে দেয়া যায়।

বিভিন্ন সমীক্ষায় দেখা গেছে, শতকরা দুই থেকে পাঁচ ভাগ রোগীদের এ ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হয়। পাইলোরিক এসটেনোসিস হলে খাদ্য গ্রহণের পর পেট ফেঁপে যায়, খাদ্য হজম হয় না। খাদ্য পাকস্থলীতে জমতে থাকে। পেট বেশ ভারী হয়ে যায় এবং ঘন ঘন বমি হয়। অনেক সময় রোগী স্বেচ্ছায় গলায় আঙুল দিয়ে বমি করে। স্বাস্থ্যের দ্রুত অবনতি ঘটে। রোগী কর্মসূক্ষ্মতা হারিয়ে ফেলে। দীর্ঘদিন এ সমস্যা চলতে থাকলে মৃত্যুও ঘটতে পারে। যথাসময়ে পেপটিক আলসার নির্ণয় করে যথাযথ চিকিৎসাব্যবস্থা নিশ্চিত করতে পারলে এ ধরনের জটিলতার সৃষ্টি হয় না।

শতকরা পাঁচ ভাগ রোগীর ক্ষেত্রে পেপটিক আলসার গভীর হয়ে এক সময় পাকহৃলী বা ডিওডেনাম ফুটো হয়ে যেতে পারে। দেখা গেছে, যারা অতিমাত্রায় ধূমপান ও মদপান করেন, নিয়মিত আহার করেন না, রাত জেগে বিভিন্ন কাজকর্ম করেন, দুশিক্ষায় ভোগেন, নিয়মিত ওষুধ সেবন করেন না তাদের এ ধরনের সমস্যায় আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। পাকহৃলী বা ডিওডেনাম হঠাৎ ফুটো হলে পেটের উপরিভাগে তীব্র ব্যথা অনুভূত হয়, পেট শক্ত হয়ে যায়, শরীর অত্যন্ত খারাপ লাগে। এ ধরনের সমস্যা হলে অবশ্যই আক্রান্ত ব্যক্তিকে জরুরি ভিত্তিতে হাসপাতালে ভর্তি করতে হবে। মোগের ইতিহাস, বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে এ ধরনের সমস্যা নিরূপণ করা সম্ভব। রোগীকে নাকের ভিতর দিয়ে পাকহৃলীতে বিশেষ ধরনের টিউব দিতে হয়। শিরার মাধ্যমে পানি, ওষুধ ও লবণ প্রয়োগ করে রোগীর শারীরিক অবস্থার উন্নতি সাধন করতে হয়। যত দ্রুত সম্ভব আলসারের ফুটো অপারেশনের মাধ্যমে বন্ধ করে পরবর্তীতে যথাযথ যত্ন নিতে হয়।

ইউনুস সুশৃঙ্খল জীবনযাপন করত না। অতিমাত্রায় ধূমপান করত। রাত জেগে তাস খেলত। আহারে অনিয়ম ও আলসারের ওষুধ যথাযথভাবে সেবন না করায় তার এ দশা। কপাল ভালো, সে সময়মতো সঠিক চিকিৎসা পেয়ে প্রাণে বেঁচে গেছে।

ইউনুস অনেক কঠিন সময় পার করেছে। আজ সে সুখী। দু ছেলে বিদেশে চাকরি করে এবং ভালো রোজগার করে। মেয়েদের ভালো ঘরে পাত্রস্থ করেছে। নাতি-নাতনিদের নিয়ে এখন সুখে দিন কাটায়। পুরোনো দিনের কঠিন ও দুঃখময় মৃতি মাঝে মাঝে তাকে বিচলিত করে।

## পূর্ণিমা মধুময় দিনের স্বপ্ন দেখে



মা-বাবাকে নিয়ে রেলওয়ে কলোনির লাল ইটের ঘরে বসবাস করে অষ্টাদশী বধু পূর্ণিমা। বিয়ের পর মাসখানেক স্বামীর সাথে সংসার করেছে। স্বামী মতি মিএঞ্জি সিএনজি ট্যাঙ্গি চালিয়ে যৎসামান্য রোজগার করত, তাতে অতি কষ্টে সংসার চলত। মাঝে মাঝে আবার বকুদের কাছে ধার-কর্জ করতে হতো।

বরিশালের থামীণ জনপদে তাদের থামের বাড়ি। বাড়িতে বুড়ো মা। সামান্য কিছু জমি চাষাবাদ করে দিন পার করে কোনো রকমে। বছর দুই আগে সর্বনাশ পূর্ণিমার আর জলোচ্ছাস বুড়ো মাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। ভিটে জমি পাহারা দেয়ার আর কেউ রইল না। মতি মিএঞ্জি ঐ বছরেই বাড়ির সবকিছু বিক্রি করে দিল পদ্মাশ হাজার টাকার বিনিময়ে। সুতির নতুন শাড়ি আর শৃঙ্গ-শাশুড়ির জন্যে ওমুধ নিয়ে আসে ফেরার পথে। নতুন শাড়ি পড়ে পূর্ণিমা পাশের বাঙ্কবীর বাড়ি ঘুরে আসে। বেশ খুশি মনে স্বামীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। হাসিমুখে মিঠি পানের বিলি আনন্দে নতুন মাত্রা জোগায়। স্বামী-স্ত্রী রাত পার করে গল্পে গল্পে।

এভাবে টেনে ছিঁড়ে দিন কাটে তাদের। অনেক কষ্টে মতি মিএঞ্জি ভিসা জোগাড় করে পাড়ি জমাল মধ্যপ্রাচ্যে। অনেক টাকা রোজগার হবে, নতুন বাড়ি হবে, দশ বিশটা রিকসা কিনে ভাড়া দেবে, ঘরে আসবে নতুন মেহমান ইত্যাদি কত স্বপ্ন তার!

দেখতে দেখতে কেটে গেল তিন তিনটে বছর। প্রথম প্রথম মতি মিএঞ্জা মোবাইল ফোনে প্রায়ই কথা বলত বড়য়ের সাথে। এখন আর তেমন খৌজ নেয় না। টাকা-পয়সাও পাঠায় না। অনেক দুশ্চিন্তায় দিন কাটে পূর্ণিমার। সংসারের খরচ জোগাড় করতে পূর্ণিমা কাজ নেয় গার্মেন্টস ফ্যাষ্টরিতে। অসুস্থ মা-বাবার খাবার, ওষুধ-পথ্য জোগাড় করতে হিমশিম খেতে হয় তাকে। প্রায়ই ওভার টাইম করে অনেক রাতে বাড়ি ফেরে। বন্ধু-বাক্স তার অনেক। ছুটির দিনে মজাদার খাওয়া-দাওয়া আর খোশগল্লে মেতে ওঠে সবাইকে নিয়ে। বন্ধুরা এসবের খরচ জোগান দেয়। এমনি করে চলছিল দিন।

এক রাতের কথা। হঠাৎ তার তলপেটে প্রচণ্ড ব্যথা শুরু হয়। ঘরে মা-বাবা কী আর করবে! বুড়ো মা ছটফট করে, কোথায় ভাঙ্গার আর কোথায়বা ওষুধ। পূর্ণিমা দু-চারবার মোবাইলে বন্ধুদের ফোন করে। ঐ রাতে সবাই যেন ঘুমের ঘোরে অচেতন। ভোরে এক বাক্সবী এসে তাকে নিয়ে যায় কাছের হাসপাতালে। সকাল আটটা হবে। ভাঙ্গার সাহেব সবেমাত্র চেম্বারে এসেছেন। সহকারীরা তখনো এসে পৌছেনি। পূর্ণিমার চিকিৎসায় ব্যস্ত হয়ে ওঠেন ভাঙ্গার সাহেব। তার তলপেটে খুব ব্যথা, মাঝে মাঝে বমি করছে। গায়েও বেশ জুর। ড. সাহেব বেশ কিছু বিষয় জিজ্ঞেস করলেন তাকে। বিয়ে কবে হয়েছে, স্বামী কী করেন, কোথায় থাকেন, বাচ্চা-কাচ্চা কতজন ইত্যাদি। সব বুঝেওনে বললেন, ‘তলপেটে ইনফেকশন হয়েছে। অনেক দিন ওষুধ খেতে হবে’।

রক্ত, প্রস্রাব আর ঘোনপথের পুঁজ পরীক্ষা করতে লিখে দিলেন।

হাসপাতালে ওষুধ সরবরাহ অপ্রতুল। প্রয়োজনীয় কিছু ওষুধের নাম লিখে প্রেসক্রিপশন করে দেন। দু সপ্তাহ ধরে সে ভাঙ্গার সাহেবের চেম্বারে আসা যাওয়া করেছে। অবশ্যে পেটের ব্যথা সেরেছে। দিন পনের পর শারীরিক সুস্থিতার প্রমাণ-পত্র নিয়ে আবার কাজে যোগ দিয়েছে পূর্ণিমা। চিকিৎসা বাবদ খরচ হয়েছে অনেক টাকা। বন্ধুদের কাছে ধার করতে হয়েছে। পূর্ণিমার মনে নানা শঙ্কা। তবুও ভবিষ্যতের মধুর দিনগুলোর স্বপ্ন দেখে।

পূর্ণিমার হঠাৎ পেট ব্যথার কারণ কী এবং তা নির্ণয়ের উপায় কি নিশ্চয়ই পাঠকের জ্ঞানার কৌতুহল জাগছে।

পূর্ণিমা যে রোগে আক্রান্ত হয়েছিল তার নাম ডিম্বনালির হঠাৎ প্রদাহ। মেয়েদের তলপেটে জরায়ুর সাথে দুদিকে লাগানো থাকে দুটো ডিম্বনালি বা ফেলোপিয়ান টিউব। ডিম্বাশয় বা ওভারি থেকে যৌবন বয়সে মাসের নির্দিষ্ট সময়ে ডিম্বক বা ওভাম বের হয়। ওভাম ডিম্বনালি পথে জরায়ু বা ইউটেরোসে আসে। স্বামীর সাথে মিলনের ফলে যে শুক্রকীট বের হয় তার সাথে ডিম্বকোষের মিলন হয়। আর এর থেকে তৈরি হয় মানব সন্তান।

বিভিন্ন কারণে ডিম্বনালির হঠাৎ প্রদাহ হতে পারে। সাধারণত ১৬ থেকে ২৫ বছরের মহিলারা এ রোগে আক্রান্ত হয় বেশি। আক্রান্ত হওয়ার বিভিন্ন কারণ

রয়েছে। অনেকের ধারণা, ঝুতুস্ত্রাবের সময় জরায়ুর মুখ খুলে যায়। কারো কারো যৌনিপথে বিভিন্ন জীবাণু যেমন: গনোরিয়ার জীবাণু, ক্রেমেডিয়া, ট্রাইকোমোনাস ইত্যাদি রয়েছে। এসব জীবাণু ঝুতুস্ত্রাবের সময় সহজেই জরায়ুতে চুকে পড়ে ও ডিম্বনালিতে চলে যায়। ফলে ডিম্বনালির হঠাত প্রদাহ শুরু হয়। যারা ঝুতুস্ত্রাবের সময় পরিকার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখে না, যয়লা পুরোনো কাপড় ঝুতুস্ত্রাবে ব্যবহার করে, তাদেরও এ ধরনের রোগ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। এ ছাড়া যেসব মহিলা একাধিক পুরুষের সাথে সহবাস করে কিংবা গনোরিয়ায় আক্রান্ত পুরুষের সাথে মেলামেশা করে, তারা এ রোগে আক্রান্ত হতে পারে। সাধারণত দরিদ্র ও সামাজিকভাবে অবহেলিত কিংবা যৌন ব্যভিচারে লিঙ্গ নারীদের এ ধরনের রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। এক সমীক্ষায় দেখা গেছে সমাজের শতকরা এগার ভাগ মহিলা কোনো না কোনো সময় এ রোগে আক্রান্ত হয় এবং এদের শতকরা নিশ ভাগ হাসপাতালে ভর্তি হয়।

ডিম্বনালির প্রদাহ হলে হঠাত তলপেটের উভয় পাশে খুব ব্যথা হয়, বমির ভাব হয় কিংবা বমি হয়, গায়ে বেশ জ্বর আসে। শরীর ভালো লাগে না, খাওয়ায় রুচি থাকে না। দৈনন্দিন কাজকর্ম সম্পাদন সম্ভব হয় না। যৌনিপথ দিয়ে পুঁজি বের হয়। রোগের সঠিক ইতিহাস, রোগীর রক্ত পরীক্ষা, যৌনিপথের পুঁজি পরীক্ষা ইত্যাদির মাধ্যমে সহজেই এ রোগ নির্ণয় করা যায়। অন্যান্য কিছু রোগ যেমন : অ্যাপেনডিকিসের হঠাত প্রদাহ, প্রস্ত্রাবের ইনফেকশন, প্রস্ত্রাবের রাস্তায় পাথর আটকালে এ ধরনের ব্যথা অনুভূত হতে পারে। তবে সঠিকভাবে রোগের ইতিহাস পর্যালোচনা করে ও প্রয়োজনে বিশেষ বিশেষ পরীক্ষা যেমন : পেটের আলট্রাসনোগ্রাফি ও এক্স-রে ইত্যাদি সম্পন্ন করে এসব রোগের উপস্থিতি নির্ণয় করা সম্ভব। অনেক সময় ডিম্বনালির প্রদাহ হলে তা অ্যাপেনডিকিসের হঠাত প্রদাহ মনে করে ভুলবশত অপারেশন করা হয়, যা কোনোমতেই কাম্য নয়। এতে তলপেটের ইনফেকশন সারা পেটে ছড়িয়ে পড়ে এবং মৃত্যুবুঝি দেখা দেয়। তাই এসব ক্ষেত্রে রোগ নির্ণয়ে অত্যন্ত মনোযোগী ও সতর্ক হওয়া শ্রেয়। প্রয়োজনে মহিলারোগ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া উচিত। ডিম্বনালির হঠাত প্রদাহ হলে অন্তত দু সন্তান জীবাণু ও বেদনানাশক ওষুধ সেবন করতে হয়। এ সময়ে প্রচুর বিশ্বামৈর প্রয়োজন। বিশেষ কিছু ক্ষেত্রে এ রোগ সংক্রামক বিধায় স্বামী-স্ত্রী উভয়কেই পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা দরকার এবং প্রয়োজনে আক্রান্ত পুরুষকেও যথাযথভাবে ওষুধ সেবন করতে হয়। বহু পুরুষের সাথে সহবাস অবশ্যই বর্জন করতে হবে।

ডিম্বনালির হঠাত প্রদাহজনিত রোগ সাধারণত সঠিক চিকিৎসায় সেরে যায়। চিকিৎসায় ক্রটি হলে কিংবা রোগী সময়মতো চিকিৎসকের শরণপন্থ না হলে বিভিন্ন জটিলতার সৃষ্টি হতে পারে। আর এসব জটিলতার ফলে ইনফেকশন সারা পেটে, শরীরের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়ে ও মৃত্যুবুঝি দেখা দেয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তা পুরোনো রোগ-ব্যাধিতে পরিণত হয়। ফলে আক্রান্ত নারী গর্ভধারণ করতে

পারেন না ও বাচ্চা-কাচ্চা হয় না। আবার কোনো কোনো নারী জরায়ুর বাইরে অস্বাভাবিক স্থানে গর্ভধারণ করে, যাকে আমরা একটোপিক প্রেগনেন্সি বলি। একটোপিক প্রেগনেন্সিও এক ধরনের মারাত্মক ও মৃত্যুবুঝিপূর্ণ সমস্যা। এসব অনুধাবন করে ডিম্বনালির হঠাত প্রদাহজনিত রোগের সময়মতো ও যথাযথ চিকিৎসা করা প্রয়োজন।

এ রোগ প্রতিরোধে অবশ্যই মাসিকের সময় স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটারি টাওয়েল ব্যবহার করা প্রয়োজন। বহু পুরুষ বা যৌন রোগাত্মক পুরুষের সাথে সহবাস অবশ্যই বর্জন করতে হবে। মনে রাখতে হবে সুশৃঙ্খল ও পরিচ্ছন্ন জীবনযাপনই এ রোগের প্রধান প্রতিরোধব্যবস্থা।

পূর্ণিমা কেন এ রোগে আক্রান্ত হয়েছে তা খতিয়ে দেখেননি ডাক্তার সাহেব। সে সুস্থ, এতেই তিনি খুশি। পূর্ণিমা এখন সুন্দর ও সুশৃঙ্খল জীবনযাপন করছে এবং স্বামী ফেরার অপেক্ষায় আছে। বুক ভরে লালন করছে হাজারো স্বপ্ন। মা হবে, আনন্দ, সুখে-সোহাগে ভরে উঠবে তাদের আগামী দিনগুলো—এই প্রত্যাশায় দিন কাটে তার।

## গৰ্জা হলে রক্ষা নাই কথাটা সত্য নয়



জৈবিতের কাঠফাটা রোদ্দুর। বেলা তিনটে। মিনিট পনের আগে খাওয়া-দাওয়া শেষ করে সবেমাত্র বিছানায় গা এলিয়েছেন ডা. রফিক। সকাল থেকে হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমে শরীর বেশ ক্লান্ত, অবসন্ন। টিঅ্যাভটির ফোনটা বারবার বাজতে লাগল। খানিকটা বিরক্ত বোধ করলেন। বিশ্রাম নেয়া বুঝি আর হলো না। টেলিফোনটা আলতোভাবে উঠিয়ে মৃদু কঢ়ে বললেন—

-জি, বলুন।

-স্যার, আপনার জরুরি সাহায্য দরকার। হাসপাতালে আসতে হবে। অ্যাম্বুলেন্স পাঠিয়েছি।

অনেক কঢ়ে বিছানা ছেড়ে উঠলেন ডা. রফিক উঞ্জাহ। চোখ মুছতে মুছতে ব্যালকনি দিয়ে তাকিয়ে দেখেন বাসার সামনে অ্যাম্বুলেন্স অপেক্ষা করছে। তৈরি হয়ে নিচে নামলেন।

রাস্তাঘাট অনেকটা ফাঁকা। দেশে জরুরি অবস্থা চলছে। জনসাধারণের চলাচল অনেকটা কম। নামী-দামি চকচকে নতুন গাড়িগুলো হঠাতে কোথায় যেন উধাও হয়ে গেছে। পুরোনো কিছু গাড়ি, সিএনজি, রিকশা বিক্ষিণ্ডভাবে চলাচল করছে। মাঝে মাঝে মিলিটারির গাড়িগুলো বিকট শব্দে দ্রুতবেগে ধেয়ে চলেছে। অ্যাম্বুলেন্সের ড্রাইভার রেডিও অন করে দেশের খবর শুনছে। কে বা কারা যেন হেসে হেসে বলছে, ‘জালে অনেক রুই-কাতলা ধরা পড়েছে। খেয়ে খেয়ে ওদের পেট বেশ

মোটা হয়েছে। এবার এদের বড়-ডেকের ভাত খাওয়ানো দরকার'। ডা. সাহেবের দিকে নজর পড়তেই ড্রাইভার টুক করে রেডিওটা বন্ধ করে দিল। রঞ্জি-কাতলার বাকি খবর আর শুনতে পারলেন না তিনি। দ্রুতবেগে অ্যাম্বুলেন্স ধেয়ে চলল হাসপাতালের দিকে। পথে হঠাত মিলিটারির গাড়ি এসে থামল অ্যাম্বুলেন্সের সামনে। একজন মিলিটারি গাড়ি থেকে নেমে এগিয়ে এসে বললেন, 'সালাম। কোথায় যাবেন? পরিচয় জানতে পারি? আপনি কোন দলের লোক স্যার?'

ভিজিটিং কার্ডটা বের করে দেখালেন।

— হাসপাতালে যাচ্ছি। জরুরি অপারেশন আছে।

— কিছু মনে করবেন না স্যার। আইডেন্টিটি কার্ড বানিয়ে নেবেন।

চুপ করে রাইলেন ড. রফিক। অ্যাম্বুলেন্স হাসপাতালে পৌছল। তড়িঘড়ি করে অপারেশন থিয়েটারের ড্রেস পরে ওটিতে ঢুকে পড়লেন। উনার তিনি সহকারী রোগীর নাড়িভুঁড়ি নিয়ে নাড়াচাড়া করছে। কী করবে বুঝে উঠতে পারছে না।

'স্যার, খুব ইন্টারেস্টিং কেস। ভদ্রমহিলা গত রাতে হঠাত পেট ব্যথা নিয়ে ভর্তি হয়েছিলেন। জরুরি চিকিৎসা দিয়েছি। এব্র-রে করে দেখলাম অন্ত ফুটো হয়ে গেছে। অবস্থার অবনতি হবে বিধায় অপারেশনের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। নাড়িভুঁড়ির যা মারাত্মক অবস্থা। কী করব বুঝতে পারছি না স্যার'।

বিলম্ব না করে অপারেশন টিমে যোগ দিলেন ডা. রফিক। পেট ভর্তি পুঁজ-পানি। নাড়িভুঁড়িগুলোর পচা পচা ভাব। ক্ষুদ্রাত্মের এক জায়গায় বড় একটা ফুটো। দুর্গন্ধময় মল আর হাওয়া ঐ ছিন্দ দিয়ে ভুড়ভুড় করে বের হচ্ছে। পুরো অপারেশন থিয়েটারটাই দুর্গন্ধময় হয়ে গেল নিমেষে। দুজন থিয়েটার সিস্টার নাকে কাপড় দিয়ে প্রস্থান করলেন। ঘণ্টা তিনেক কাজ করে রোগীর ছেঁড়া-বেঢ়া নাড়িভুঁড়ি মেরামত করলেন। সবার চোখে-মুখে খুশির ছায়া। রোগীটা হয়তো বেঁচে যাবে। তখনো ভেন্টিলেশন মেশিনে। প্রস্তাবের নল দিয়ে বেশ প্রস্তাব আসতে শুরু করল।

রাত আটটা নাগাদ রোগী শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে শুরু করল। হাত-মুখ ধূয়ে গরম কফি হাতে নিয়ে পোস্ট অপারেটিভ রুমে বসল সবাই। পুরো কেস হিস্ট্রি পর্যালোচনা করলেন।

ভদ্রমহিলার নাম সালমা। বয়স পঁয়ত্রিশ। এনজিও সংস্থায় স্বল্প বেতনে চাকরি করে। দুই ছেলে, এক মেয়ে। ঘরে বুড়ো শ্বশুর-শাশুড়ি। স্বামী বেসরকারি এক শিল্প প্রতিষ্ঠানে চাকরি করতেন। বেশ কয়েক মাস ধরে ফুসফুসের যক্ষায় ভুগছেন। প্রায়ই কফের সাথে রক্ত যায়। চাকরি ছেড়ে দিয়েছেন। ঘরে সবার থেকে তাকে আলাদা করে রাখা হয়েছে। এ ধরনের যক্ষা খুব ছোঁয়াচে। থাকা খাওয়া, বাসন-কোসন, বিছানা সবই তার আলাদা। থানা হাসপাতালে নিয়মিত যাওয়া-আসা করেন। ওযুধ নেন। সুস্থ হয়ে সবার সাথে থাকবে, সেই সুদিনের অপেক্ষায় আছে।

সালমা প্রায় এক মাস হাসপাতালে কাটালেন। ইতিমধ্যে তার অঙ্গের বায়োল্সি লিপোট হাতে এল। অন্তে যন্ত্রা বা টিউবারকুলোসিস হয়েছে। স্বামী-স্ত্রীর একই রোগ। তাকে যন্ত্রার ওষুধ দেয়া হলো। ধীরে ধীরে সালমা সুস্থ হয়ে উঠলেন। পেটের কাটা জায়গায় ইনফেকশন হয়েছিল। নিয়মিত ঘায়ের ড্রেসিং করতে হয়েছে। সালমা সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরলেন। তবে অসুস্থতার কারণ গোপন রাখা হলো অনেকের কাছে।

টিউবারকুলোসিস বা যন্ত্রা খুব মারাত্মক ব্যাধি। এ রোগে বিশ্বে প্রতিবছর লক্ষ লক্ষ লোক মারা যায়। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে এর আক্রমণ সবচেয়ে বেশি। আক্রান্ত রোগীদের শতকরা পঁচানবই ভাগ উন্নয়নশীল দেশের। আর মৃত্যুবরণকারীদেরও শতকরা আটানবই ভাগ এসব দেশের লোক। এখন দেখা যাক, টিউবারকুলোসিস বলতে আমরা কী বুঝি। এর লক্ষণগুলো কী কী এবং এর থেকে পরিচাল পাওয়ার উপায়ই বা কী?

টিউবারকুলোসিস শব্দটি ল্যাটিন শব্দ 'টিউবারক্যাল' থেকে এসেছে। টিউবারক্যাল বলতে শরীরের এক অস্বাভাবিক স্ফীত জায়গা বা চাকসদৃশ অংশকে বোঝায়। মাইকোব্যাকটেরিয়াম টিউবারকুলোসিস নামক এক ধরনের জীবাণু বা ব্যাকটেরিয়া এ রোগের জন্য দায়ী। ১৮৮২ সালে জার্মান বিজ্ঞানী রবার্ট কক সর্বপ্রথম এ রোগের জীবাণু আবিষ্কার করেন। এর আগে এ রোগকে পুরোনো কফ, থাইসিস, ফুসফুসের পুরোনো ইনফেকশন ইত্যাদি মরণ-সমস্যা বলে আখ্যায়িত করা হতো। প্রচলিত প্রবাদ—যন্ত্রা হলে রক্ষা নাই। অর্থাৎ যন্ত্রা হলে মৃত্যু অবধারিত। যন্ত্রায় নিরাময়ে কোনো কার্যকর ওষুধ তখনো আবিষ্কৃত হয়নি। তাই যন্ত্রায় আক্রান্ত রোগীকে আলাদাভাবে আঁধার ঘরে কিংবা পাঠা ছাগলের সাথে বসবাস করতে দেয়া হতো। এ ছাড়া বিভিন্ন ধরনের ঝাড়-ফুক, তাবিজ-দোয়া, পানি পড়া ইত্যাদির ব্যবস্থা নেয়া হতো। ধারণা করা হতো অঙ্গকারে থাকলে এ রোগ কমে যায় কিংবা পাঠা ছাগলের দুর্গম্বে এদের জীবাণু মরে যায়।

সেই যুগে এ রোগের আক্রমণে অনেক নামকরা কবি, সাহিত্যিক ও বৈজ্ঞানিকের জীবন-দীপ অকালে নিভে গেছে। কমলা নেহের, মুলি প্রেমচান্দ, শেলী, সুকান্ত প্রমুখ অনেক উজ্জ্বল নক্ষত্র অকালে বারে পড়েন যন্ত্রার আক্রমণে।

যন্ত্রায় সাধারণত ফুসফুসই আক্রান্ত হয় বেশি। একে আমরা ফুসফুসের যন্ত্রা বা পালমোনারি টিউবারকুলোসিস বলি। ফুসফুস যন্ত্রায় আক্রান্ত হলে দীর্ঘদিন ধরে কাশি হয়, কফের সাথে রক্ত যায়। গায়ে জ্বর থাকে। শরীর শুকিয়ে যায় ও খাদ্যে অরুচি হয়। সাধারণ জীবাণুনাশক ওষুধ সেবনে এ ধরনের কফ-কাশি সারে না। সময়মতো চিকিৎসা না করালে ফুসফুস নষ্ট হয়ে যায়। অনেক সময় বুকে পানি জমে কিংবা ফুসফুস ফুটো হয়ে যায়। বুকে বাতাস জমে, শ্বাসকষ্ট হয়। কখনো বা কাশির সাথে প্রচুর রক্ত যায় এবং রোগী মৃত্যু মুখে পতিত হয়।

সাধারণত মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্তরাই যক্ষায় আক্রমণ হয় বেশি। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বসবাস, পুষ্টিহীনতা এ রোগের অন্যতম কারণ। যারা বহুমুক্ত কিংবা এইডস রোগে ভুগছেন তারাও সহজেই এ রোগে আক্রমণ হতে পারেন। নারী-পুরুষ, ছেট-বড় সব বয়সেই এ রোগের প্রকোপ উল্লেখযোগ্য। সুতরাং যাদের কফ-কাশি দু মাসের বেশি স্থায়ী হয়, সাধারণ জীবাণুনাশক ওষুধে কাশি সারে না, কাশির সাথে রক্ত যায়, গায়ে জ্বর আসে, শরীর শুকিয়ে যায় ও খাদ্যে অরুচি হয়, তাদের যক্ষার আক্রমণ হয়েছে এমনটি সন্দেহ করতে হবে। এ অবস্থায় অভিজ্ঞ যক্ষা-বিশেষজ্ঞের পরামর্শ ও চিকিৎসা নিতে হবে। রক্ত ও কফ পরীক্ষা, বুকের এঝ-রে ইত্যাদির মাধ্যমে সহজেই যক্ষা নির্ণয় করা যায়। কফের সাথে যক্ষার জীবাণু বের হলে এ রোগ অবশ্যই হোঁয়াচে। এ অবস্থায় যক্ষা সহজেই আশেপাশে বসবাসকারী লোকদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে পারে। তাই এসব রোগীকে আলাদাভাবে থাকতে হবে এবং নিয়মিত সঠিক মাত্রায় ওষুধ সেবন করতে হবে।

যক্ষার প্রথম ওষুধ স্ট্রেপটোমাইসিন। এ ওষুধ আবিক্ষারের ফলে যক্ষার চিকিৎসায় অভূতপূর্ব সাফল্য আসে। অনেকে ঐ সময় তা সেবন করে আরোগ্য লাভ করেছেন। পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার কথা বিবেচনা করে বর্তমানে এ ওষুধ কম ব্যবহৃত হয়। বিস্তৃত গবেষণার ফলে আরো অনেক কার্যকর ওষুধ আবিকৃত হয়েছে। সময়মতো এসব ওষুধ সেবন করলে যক্ষা সম্পূর্ণ ভালো হয়ে যায়। বর্তমানে বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে যক্ষার প্রতিযেধক টিকা বিসিজি প্রয়োগ করা হচ্ছে। তাছাড়া যক্ষার নিরাময়ে বিভিন্ন কার্যকর প্রকল্পও বাস্তবায়িত হচ্ছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এ রোগকে বিশ্বের বিশেষ ঘাতক ব্যাধি হিসেবে চিহ্নিত করে বিভিন্ন কার্যকর ব্যবস্থা নিচ্ছে। এতে বিভিন্ন দেশে উল্লেখযোগ্য সুফল পাওয়া যাচ্ছে। বাংলাদেশেও এর সুফল চোখে পড়ার মতো।

যক্ষার জীবাণু ফুসফুস ছাড়াও শরীরের অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও আক্রমণ করতে পারে। দেহের বিভিন্ন লসিকাগ্রস্থি, অন্ত্র, হাড়, কোমল কলা ইত্যাদি এ রোগে আক্রান্ত হতে পারে। পেটের যক্ষা বিভিন্নভাবে প্রতীয়মান হয়। অন্ত্রে যক্ষা হলে তাতে ঘা হয়, অন্ত্র সরু হয়ে যায়। পেটে পানি জমে। এমনকি অন্ত্র ফুটো হয়ে যেতে পারে। যেমনটি হয়েছে সালমার।

বিভিন্ন দেশের সমীক্ষায় দেখা গেছে, হঠাতে পেট ব্যথার শতকরা পাঁচ থেকে সাত ভাগ কারণ পেটের যক্ষা। অন্ত্র যেসব কারণে ফুটো হয় তার দু থেকে সাত ভাগ হয় যক্ষার কারণে। অন্ত্রে যক্ষা হলে পেটে ব্যথা হয়, খাওয়ার পর পেট ফেঁপে যায়। পায়খানায় বিভিন্ন ধরনের অনিয়ম দেখা দেয়। কখনো কোষ্ঠকাঠিন্য, আবার কখনোবা পাতলা পায়খানা হয়। পেটে অনেক সময় বেশ বড় বড় শব্দ হয়। শরীরের ওজন কমতে থাকে, গায়ে জ্বর আসে। সময়মতো ব্যবস্থা নিতে না পারলে অন্ত্রের তেতরের পথ অত্যন্ত সরু হয়ে যায় এবং একসময় পায়খানা বন্ধ হয়ে যায়। এ অবস্থায় আক্রমণ ব্যক্তির পেট ফুলে যায় ও বমি হয়। প্রস্রাব করে যায়। একে

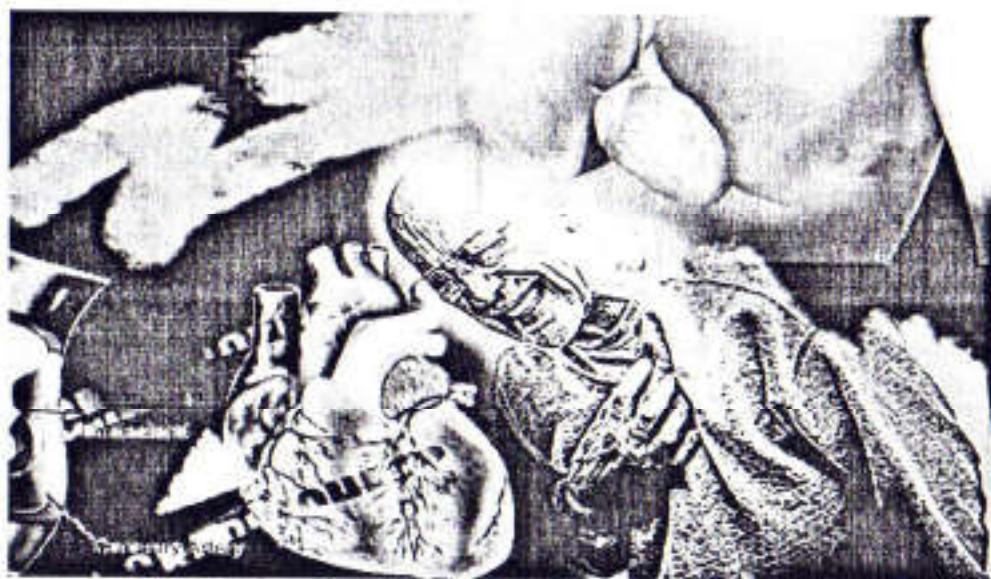
আমরা ইনটেস্টাইনাল অবস্ট্রাকশন বলি। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে যন্ত্রার ঘা  
গভীর হতে গভীরতর হয় এবং এক পর্যায়ে ঐ জায়গায় ফুটো হয়ে যায়। এ অবস্থায়  
রোগীর হঠাতে পেটে ব্যথা অনুভূত হয় এবং পেট ফুলে যায়। এটা অত্যন্ত জরুরি  
শারীরিক সমস্যা। বিভিন্ন পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে এ রোগ নিরূপণ করা  
সম্ভব। তবে অনেক ক্ষেত্রে এ ধরনের ব্যথা পেপটিক আলসারের ব্যথা কিংবা  
পেপটিক আলসারের কারণে অস্ত্র বা পাকস্থলী ফুটো হয়েছে এমনটি ধারণা করা  
হতে পারে। এ অবস্থায় অনেকেই ভুল করে গ্যাসট্রিকের বিভিন্ন ঔষুধ সেবন করেন  
যা অত্যন্ত বিপজ্জনক। কোনো কোনো ক্ষেত্রে পেটে যন্ত্রার আক্রমণে অস্ত্র, চর্বি  
ইত্যাদি একেও হয়ে বড় চাক বা টিউমাইলদৃশ ডাক্তার সৃষ্টি করে। তা ছাড়া যন্ত্রার  
ফলে পেটে পানি জমলে পেটে ক্যান্সার হয়েছে বলে ধারণা করা হতে পারে। কফ  
পরীক্ষা, পেটের এক্স-রে, আল্ট্রাসনেগ্রাফি, সিটি স্ক্যান, কোলনোকপি ও  
ক্ষেত্রবিশেষে অন্তরে বায়োলি করে সঠিকভাবে রোগ নিরূপণ সম্ভব। পেটে যন্ত্রা  
হলে তা সময়মতো নিরূপণ করে যন্ত্রার ঔষুধ প্রয়োগ করতে পারলে তা সম্পূর্ণ  
ভালো হয়ে যায়।

সালমার অঙ্গে যন্ত্রা হয়েছে। স্বামীও দীর্ঘদিন ধরে যন্ত্রায় ভুগছে। স্বামীর  
পরিচর্যা করতে গিয়ে সালমা ও যন্ত্রায় আক্রান্ত হয়েছে। এক্স-রে করে সালমার  
বুকেও যন্ত্রার ক্ষত ধরা পড়েছে। পয়সার অভাবে বড় ডাক্তারের চিকিৎসা নিতে  
পারেনি। ফলে যন্ত্রার ঘা গভীর হয়ে এক পর্যায়ে অস্ত্র ফুটো হয়ে গেছে। পরম  
করুণাময়ের অশেষ দয়া আর ডাক্তারদের সঠিক চিকিৎসায় সালমা আরোগ্য লাভ  
করেছে। চিকিৎসা বাবদ তার অর্থ ব্যয় হয়েছে প্রচুর। এ খরচ মেটাতে তাকে  
বাড়ির জমিগুলো তুলে দিতে হয়েছে অন্যের হাতে। ভিটেবাড়ি এখন তার শেষ  
সম্বল।

সালমার শরীর এখনো খুব দুর্বল। মাস তিনেক কাজে যেতে পারেনি।  
প্রতিষ্ঠানের বড় কর্তার দয়ায় চাকরিটা কোনো রকমে রক্ষা পেয়েছে। অফিসের  
বকুলের কাছে অনেক টাকা ধার করতে হয়েছে।

দীর্ঘ ছয় মাস সালমা যন্ত্রার ঔষুধ সেবন করেছে। যন্ত্রা থেকে রক্ষা পেয়ে  
সালমা নতুনভাবে জীবন গড়ার দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে এগিয়ে চলেছে। সালমার স্বামী  
এখন খুবই খুশি। তিনিও এখন নিরাময়ের স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছেন।

## হৃদয়ের একূল ওকূল



গ্রামের নাম বিজয়নগর। দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে সীমান্তবর্তী এলাকার বর্ধিষ্ঠ জনপদ এটি। একাত্তরে জুনের শেষ দিকে মুক্তিবাহিনী এখানে স্বাধীনতার পতাকা উড়ায়। শফিক উদ্দিন এ গ্রামেরই একজন জনপ্রতিনিধি। পরপর দুবার বিপুল ভোটের ব্যবধানে নির্বাচনে জয়লাভ করে ইউনিয়ন পরিষদের সুযোগ্য চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছেন। গ্রামের সবার কাছে তিনি শফিভাই নামেই সুপরিচিত।

শফিভাই সুপুরুষ। গায়ের রং গৌরবর্ণ। বড় বড় চোখ, লম্বা পৌফ, সুবিন্যস্ত কোকড়ানো ঘন কালো চুল- সবকিছু মিলে তিনি বেশ মানানসই। ভালোই চলছিল গ্রামের জনজীবন।

বছর তিনেক আগের কথা। দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি তখন উত্তপ্ত। নির্বাচন নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলো যখন মুখোমুখি তখন দেশকে সন্ত্রাস আর দুর্নীতিমুক্ত করার প্রয়োগান নিয়ে এগিয়ে আসেন শফিভাই। কেটে গেল ঘটনাবহুল দু দুটো বছর। নির্বাচনে বিজয়ী দল নতুন সরকার গঠন করল। ‘দিন বদলের পালা’ সংযোজিত হলো দেশ পরিচালনার নীতিতে। শফিভাই শফিভাই-ই রয়ে গেলেন। তবে জনগণের স্বার্থের কথা ভাবেন, কাজও করেন যথাসাধ্য। ইদানীং তাঁর শরীরের অসুখটা বেশ বেড়ে গেছে। বছর কয়েক ধরে ভুগছেন উচ্চরঞ্চাপে। কাজের চাপে নিয়মিত ওষুধ সেবন করতে ভুলে যান।

মাসকয়েক আগের কথা। গ্রামের মুরব্বি আর মেৰারদের নিয়ে এক সালিসি বৈঠক বসিয়েছেন। সালিসের বিষয়বস্তু একটু অন্য রকমের। ফরিদ মিএওয়ার দ্বিতীয় বৌ পুতুল। সে স্বামী ফরিদ মিএওয়াকে তালাক দিতে চায়। ফরিদ মিএওয়া নিকটবর্তী

থানার ভূমি অফিসে চাকরি করেন। রোজগারপাতি বেশ ভালো। পুতুলের অভিযোগ- স্বামী ফরিদ মিএও মোটেই ভালো মানুষ নয়। তার প্রথম ঘরে বৌ-বাচ্চা রয়েছে। পুতুলকে বিয়ে করার সময় এসব গোপন রেখেছিল। ফরিদ মিএওর প্রথম সংসার ঢাকায় ফ্ল্যাট বাড়িতে থাকে। ফরিদ মিএও রাতে তাস খেলে, বেশি বেশি মদপান করে, সিগারেট খায়, খুব বেশি মিথ্যে কথা বলে, অফিসে ঘুষ খায়, বাজে লোকদের সাথে আড়ত দেয়, ঘন ঘন ঢাকা যায় ইত্যাদি ইত্যাদি। সুতরাং এত বাজে পুরুষের সাথে তার সংসার করা সম্ভব নয়। পুতুল সবকিছু লিখিতভাবে চেয়ারম্যান শফিক উদ্দিনকে জানিয়েছে। কিছু কিছু তথ্য প্রমাণও হাজির করেছে অভিযোগের সাথে। সালিস নিষ্পত্তিতে নিবন্ধন, এলাকাভুড়ে এমন সুনাম রয়েছে শফিভাইয়ের।

নিজ বাড়ির বড় উঠোনে সালিসের আসর বসেছে। শফিভাই একটু মেজাজি স্বভাবের। মিথ্যে কথা, অন্যায় আচরণ, বাজে অভ্যাস ইত্যাদির কথা শুনলে তেলে-বেগুনে ঝুলে ওঠেন।

বিচারকাজ চলছে। অনেক লোকজন জড়ে হয়েছেন সভাস্থলে। বিচারকরা বিভিন্নভাবে বিশ্বেষণ করছেন পুতুলের আরজি। পুতুল অদূরে দাঁড়িয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। সবকিছু শুনে শফিভাই হঠাৎ খুব রাগান্বিত হয়ে উঠলেন। ‘ফরিদ মিএও অপরাধী। দ্বিতীয়বার বিয়ে তার আইনসিদ্ধ হয়নি। প্রথম সংসার গোপন করেছে, মদ খায়, অফিসে ঘুষ ছাড়া ফাইলে সহি করে না। এসব কি মারাত্মক অন্যায় নয়? চরিত্রের এমন রূপ যার সে একজন দুর্নীতিবাজ’।

এত অন্যায় কিছুতেই মানতে পারছিলেন না চেয়ারম্যান শফিভাই। ফর্সা মুখখানা মুহূর্তেই কোভে লাল টকটকে হয়ে উঠল। চেঁচিয়ে বলে উঠলেন, ‘ফরিদ মিএও কই? কী জবাব দেবে’?

এসব বলতে বলতে বুকে হাত রেখে ঘরে চুকে গেলেন। কেউ বুঝতেই পারল না তাঁর বুকে বেশ ব্যথা হচ্ছিল। ঢক ঢক করে এক গ্রাস ঠাণ্ডা জল পান করলেন। তার বুকটা যেন কিসে জোরে চেপে ধরেছে। হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। সারা শরীরে আচুর ঘাম ব্যরছে। বুকের ব্যথা দ্রুত পেটের উপরিভাগে, বাম হাত ও গলার দিকে ছড়িয়ে পড়ল। দু-দুবার বমি হলো। বৌকে পাঠিয়ে সালিস বিচার মূলতবি ঘোষণা করলেন। মেঘার মতি মিএওকে ডেকে বললেন, ‘বেশ খারাপ লাগছে। পরে পুতুলের আবেদন বিবেচনা করব’।

সবাই ফিরে গেলেন নিজ নিজ বাড়িতে। উঠোন অনেকটা খালি হয়ে গেল।

শফিক উদ্দিনের মোটেই ভালো লাগছিল না। গ্যাসট্রিকের দু-দুটো ট্যাবলেট এক সাথে গিলে মাথার উপরে ফ্যান্টা বেশ জোরে ছেড়ে দিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লেন। বড়কে ডেকে ক্ষীণ কঢ়ে বললেন, ‘রতনের মা, এবার বুঝি আর বাঁচব না। তাড়াতাড়ি আমাকে হাসপাতালে নিয়ে চল’।

রতনের মা হতবিহুল হয়ে পড়ল। ড্রাইভার ডেকে পুরোনো জিপ গাড়িতে স্বামীকে বসাল। দ্রুতবেগে জিপ শহরের দিকে ধাবিত হলো। আধঘণ্টার মধ্যে গাড়ি

এসে পৌছল নিকটবর্তী শহরের বড় হাসপাতালে। ইমারজেন্সি বিভাগের ডিউটি ডাক্তার শফিক উদ্দিনকে দেখলেন। সাথে সাথে শিরায় মরফিন ইনজেকশন প্রয়োগ করলেন। দ্রুত তাকে হাসপাতালে হার্ট চিকিৎসার জরুরি ওয়ার্ডে ভর্তি করা হলো। দামি ইনজেকশনের নাম লিখে প্রেসক্রিপশনটা শফিক উদ্দিনের ছেলের হাতে তুলে দিলেন। নাকে অ্রিজেন টিউব দেয়া হলো। বুকের যথাস্থানে সংযোগ করা হলো হার্ট মেশিনের তারগুলো। ততক্ষণে নার্স এসে দামি ইনজেকশনটা শিরায় প্রয়োগ করলেন। এবার শফিক উদ্দিনের চোখে-মুখে কিছুটা প্রশান্তির ছবি ফুটে উঠল। আন্তে আন্তে তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন। তারপর।

অনেক চিকিৎসা হলো। সন্তান তিনেক পর হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেরে বাড়ি ফিরলেন তিনি। মাস দুই অফিসে যেতে পারেননি। মেদ্বার মতি মিএঞ্জ তার অফিসের সব কাজ চালিয়ে নিলেন।

শফিক উদ্দিনের হার্ট স্ট্রোক করেছিল। কপাল ভালো তিনি সময়মতো সঠিক চিকিৎসা পেয়েছেন। হার্টের এ ধরনের হঠাতে স্ট্রোককে আমরা মায়োকার্ডিয়েল ইনফারকশন বলি। মায়োকার্ডিয়েল ইনফারকশন কী? কী কারণে এ অসুখ হয় এবং এর চিকিৎসা কী?

হার্ট বা হৃৎপিণ্ড আমাদের বক্ষগহ্বরে অবস্থিত বিশেষ মাংসপেশি দিয়ে তৈরি রক্তসঞ্চালন যন্ত্র। এ যন্ত্র প্রসারিত হলে দেহের রক্ত এতে জমা হয় এবং তা ফুসফুসে গিয়ে অ্রিজেনের সংমিশ্রণে পরিশোধিত হয়। এ রক্ত আবার হৃৎপিণ্ডে পৌছে। হৃৎপিণ্ডের সংকোচনের ফলে পরিশোধিত রক্ত আমাদের সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে। এভাবে হৃৎপিণ্ডের সংকোচন এ প্রসারণের ফলে দেহে রক্ত সঞ্চালিত হয়। ফলে আমরা বেঁচে আছি। হৃৎপিণ্ডের এ কার্যকারিতা অঙ্কুণ্ড ও যথাযথ হতে হলে হৃৎপিণ্ডের মাংসপেশীর অ্রিজেন ও পুষ্টি দরকার। করোনারি ধমনী নামক বিশেষ রক্তবাহী নালির মাধ্যমে হৃৎপিণ্ডের মাংসপেশি অ্রিজেন ও পুষ্টি পায়। ফলে হৃৎপিণ্ডের সুন্দর ও ছন্দোময় সংকোচন-প্রসারণ অবিবাম চলতে থাকে। কিন্তু কিছু বিশেষ কারণে হৃৎপিণ্ডের এসব রক্ত সংবহননালির ভেতরে এক প্রকার চর্বিজাতীয় পদার্থের প্রলেপ পড়ে। একে আমরা আর্ধারোমা বলি। এ প্রলেপ রক্তনালিকে ধীরে ধীরে সরঞ্জ করে দেয়। ফলে রক্ত চলাচল কমে যায় ও হৃৎপিণ্ডের মাংসপেশি পর্যাপ্ত অ্রিজেন ও খাদ্য পায় না। এ অবস্থায় হৃৎপিণ্ডের কার্যকলাপ দ্রুত হলে বুকে ব্যথা অনুভূত হয়। একে আমরা এনজাইন পেকটোরালিস বলি। অনেক সময় এ প্রলেপের বিশেষ স্থানে রক্ত জমাট বেঁধে যায়। ফলে রক্ত চলাচল মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়। এতে বুকে প্রচণ্ড ব্যথা অনুভূত হয় এবং হার্টের স্বাভাবিক ক্রিয়ায় ব্যাঘাত ঘটে। তখন আমরা হার্টস্ট্রোক বলি।

এ ধরনের হার্টের অসুখে বুকের মাঝখানে হঠাতে খুব ব্যথা অনুভূত হয়, বুকে বেশ চাপ চাপ ভাব লাগে, হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসে। ব্যথা ক্রমশ বাম হাতে, গলায় ও পেটের উপরি ভাগে ছড়িয়ে পড়ে। দু'একবার বমিও হয়। শরীর নিষ্ঠেজ হয়ে যায় এবং আক্রান্ত ব্যক্তি বেশ ভীতসন্ত্রিত হয়ে পড়ে। এ ধরনের পরিস্থিতিতে রোগীকে অতি দ্রুত নিকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে হার্ট চিকিৎসার জরুরি বিভাগে

ঙ্গত করাতে হবে। অতি দ্রুত ও তৎপরতার সাথে মরফিন ইনজেকশন প্রয়োগ করে মাকে অ্বিজেন ও শিরায় সেলাইন দিতে হয়। হৃদরোগ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ অনুযায়ী অন্যান্য আধুনিক চিকিৎসা ও ঔষুধপত্র প্রয়োগ করতে হবে। বর্তমানে দ্রুত ও অতি কার্যকর ঔষুধ যেমন: স্ট্রেপটোকাইনেজ ইনজেকশন শিরায় প্রয়োগ করে অনেকের জীবন বাঁচানো সম্ভব হচ্ছে। জরুরি ভিত্তিতে ইসিজি, রক্তের ক্রিয়াটিনিন কাইনেজ ইত্যাদি পরীক্ষা করে রোগের আক্রমণ বিষয়ে নিশ্চিত হতে হবে।

কিছু কিছু ক্ষেত্রে এ রোগের আক্রমণ এত মারাত্মক হয় যে মৃহৃতেই রোগী মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। যারা এ আক্রমণ কাটিয়ে ওঠেন এদের আবার বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে হার্টের রক্ত চলাচল ক্ষতিক্ষেত্র ব্যাখ্য হচ্ছে তা শঠিকভাবে নিরূপণ করতে হয়। এ ধরনের রোগীর পরবর্তীতে কিছু বিশেষ পরীক্ষা যেমন: এনজিওম, হার্টের সিটি ক্ষ্যান ইত্যাদি করানো প্রয়োজন হতে পারে। এ রোগে অতি সুশৃঙ্খল ও সতর্ক জীবন যাপন করতে হয়। নিয়মিত ঔষুধ সেবন, চর্বিজাতীয় খাদ্য সর্বতোভাবে বর্জন, নিয়মিত ব্যায়াম ইত্যাদি দীর্ঘ জীবন লাভে সহায়ক। কোনো কোনো রোগীর ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ সার্জারি বা অন্যান্য পদ্ধতি প্রয়োগের ফলে অনেকেই সুন্দর এবং দীর্ঘ জীবন লাভ করছেন।

কোনো কোনো ক্ষেত্রে রোগী হার্টের স্ট্রোককে ভুলবশত পেপটিক আলসারের ব্যথা মনে করে আলসারের ঔষুধ সেবন করেন। এতে অনেকেই জীবন-দীপ মৃহৃতেই নিতে যেতে পারে।

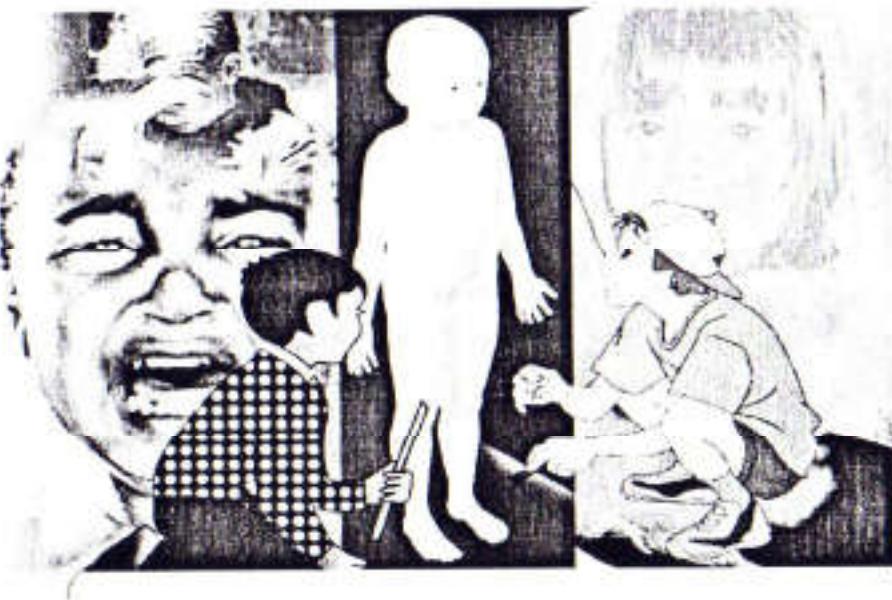
মনে রাখতে হবে, আলসারের ব্যথা এত মারাত্মক ধরনের নয়। তা পেটের উপরিভাগে শুরু হয় এবং বুকের দিকে যেতে পারে। এতে প্রচুর ঘাম হয় না ও শরীর নিষ্ঠেজ হয়ে পড়ে না। সাধারণত দু-একটা আলসারের ঔষুধ সেবনে তা অনেকটা কমে যায়। সুতরাং হঠাৎ বুকের মাঝখানে ব্যথা হলে, শরীরে খুব ঘাম হলে অত্যন্ত দ্রুততার সাথে হার্টের জরুরি চিকিৎসাকেন্দ্রে যেতে হবে। কোনো অবস্থাতেই তা আলসারের ব্যথা ভেবে আলসারের ঔষুধ সেবন করে নিরাময়ের চেষ্টা করা সম্ভীচীন নয়। এতে মারাত্মক পরিণতি এমন কি তৎক্ষণাত্ম মৃত্যুও হতে পারে।

অতএব মনে রাখতে হবে পেটের ব্যথা শুধু পেটের অসুখের কারণেই সংঘটিত হয় না। পেটের উপরিভাগের ব্যথা হার্টের স্ট্রোকেও হতে পারে।

শফিক উদ্দিন সময়মতো সঠিক চিকিৎসা পেয়েছেন। গত কয়েক মাসে দেশি-বিদেশি অনেক হৃদরোগ বিশেষজ্ঞের পরামর্শও নিয়েছেন। শরীরের ওজন কমিয়েছেন, নিয়মিত ব্যায়াম, চর্বিজাতীয় খাদ্য বর্জন করেছেন। তবে জনগণের কথা আজও ভুলেননি। সময়-সুযোগ ও সাধ্যমতো দেশের জন্য কাজ করে চলেছেন।

পুতুলের কপালে কী হলো তা খবর নিতে পারিনি। পুতুল হয়তো নতুন ঘরের ভাগ্যবতী বধু হয়ে এখন সুখে জীবনযাপন করছে।

## সজীব একা নয়



সজীবের বয়স এখন এগার। একটু দুষ্টি প্রকৃতির। লিকলিকে গড়ন। ছোট বেলায় বাবা-মা দুজনকেই হারিয়েছে। কাকা-কাকিমা ও ঠাকুরমার স্নেহ-যত্নে বেড়ে উঠেছে সে। খাওয়া-দাওয়ায় তেমন আগ্রহ নেই। পড়াশোনায়ও মন নেই। ভারি মেজাজি। সারাক্ষণ খেলাধূলা নিয়েই ব্যস্ত থাকে। ঘরের সবাই তাকে ভালোবাসে, আদর করে। অঙ্কপ্রায় বুড়ো ঠাকুরমা সারাক্ষণ তাকে ডেকে খুঁজে বেড়ায়। টেবিলে পড়ে থাকা খাবার অনেক সময় বিড়ালের পেটে যায়। সারাক্ষণ ঘাম ঝরে, কাপড়-চোপড় ভিজে যায়। পুরুরে পুরুরে সাঁতার কাটে। ঘুমায়ও বেশ। টেবিলের বই-পত্রগুলো প্রায়ই ঠাকুরমা গুছিয়ে রাখে। পাশের বাড়ির নামী শিক্ষক অনন্ত বাবু পড়াতে এসে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে চলে যান। স্কুল ছুটির পর প্রায়ই দেরি করে বাড়ি ফেরে। তবে পরীক্ষার আগে দিনরাত থাটে। মেধা ভালো। তাই পরীক্ষায় পাসও করে নিয়মিত। মা-বাবার কথা বললে বড় বড় নিঃশ্বাস ফেলে, আর ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে।

গ্রীষ্মের এক দুপুর। স্কুল থেকে এসেই সজীব পেট ধরে কান্না শুরু করল।  
বলল,

- ঠাকুরমা, মরে যাচ্ছি, পেটে ভীষণ ব্যথা।
- নিয়মিত ভাত-পানি খাসনে, তোর পেটে ব্যথা হবে না তো কার হবে রে।  
বলতে বলতে ঠাকুরমা এগিয়ে অশোন।

সজীবের ভীষণ কষ্ট হচ্ছে। বমি বমি ভাব, প্রস্তাবে খুব জুলা-যন্ত্রণা। অন্ত একটুকু যা হয় তাও টকটকে লাল। ঠাকুরমাকে সব খুলে বলল। ঠাকুরমার চোখ দুটো জলে ভরে গেল। সবাইকে ডাকাডাকি শুরু করলেন। সজীবের দূর সম্পর্কের কাকা জয়স্ত বাবু থাম্য ডাঙ্গার। ঐ এলাকায় তাঁর বেশ নামডাক। বাড়ির অদৃশে ওযুধের দোকানে তাঁর বড় চেম্বার। আমি তখন শহরের সরকারি কলেজে উচ্চ মাধ্যমিক পড়ি। সামনে ফাইনাল পরীক্ষা। বাড়িতে এসে পরীক্ষার প্রস্তুতিতেই ব্যস্ত। ঠাকুরমা আমাকেই পাঠালেন কাকার চেম্বারে। হাটের দিন, চেম্বারে রোগী আর খন্দেরের ভিড়। আমাকে দেখে খানিকটা বিরক্ত হলেন।

‘কাকা, সজীবের বেশ পেট ব্যথা। বমি করছে, খুব খারাপ লাগছে’।

কাকাবাবু রোগীদের বসতে বলে রিকশা চড়ে বাড়ি এলেন। ততক্ষণে সজীব মাটিতে গড়াগড়ি দিচ্ছে। তলপেটে খুব ব্যথা, প্রস্তাব হচ্ছে না, বমি করছে। কাঁপুনি দিয়ে গায়ে জুর এল।

কাকাবাবু সজীবকে বেশ আদর করেন। সজীবের কষ্ট দেখে তাঁর মনও খারাপ হয়ে গেল। সজীবকে তার কষ্টের কথা জিজ্ঞেস করলেন। সজীবের পেট টিপে বললেন, ‘বেশ প্রস্তাব জমে আছে। প্রস্তাব করাতে হবে’।

ব্যাগের ভেতর প্লাস্টিকের প্যাকেট খুলে পাইপ বের করলেন। যথানিয়মে তা সজীবের প্রস্তাবের রাস্তায় প্রবেশ করিয়ে বেশ পরিমাণ লাল টকটকে প্রস্তাব বের করে নিলেন। এবার সজীব একটু স্থিতি বোধ করল। তবে প্রস্তাবের রাস্তার পাইপটা এখন যেন তার সব যন্ত্রণার কারণ। কাকাবাবু তা খুলে নিলেন। তিন-চার রকমের ওযুধ মিশিয়ে দাগকাটা শিশিরে মিকশার ওযুধ তৈরি করে বললেন, ‘এই বেটা, এখন এক দাগ খেয়ে নে। পানি খাস বেশি করে। বাকিটুকু ছয় ঘন্টা পরপর এক দাগ এক দাগ করে খাস’।

ব্যাগ থেকে বেশ কয়েকটা ট্যাবলেট বের করে দিয়ে বললেন, ‘এসব একটা করে দিনে চারবার খাবি। দুধ খাস। রাতে এসে খবর নেব’।

কাকা বাবু চেম্বারে চলে গেলেন।

অনেক হাঁকডাক করে ঠাকুরমা ওযুধটুকু সজীবকে খাওয়ালেন। কাকিমা তার রুক্ত পরীক্ষা করাতে লোক নিয়ে এলেন থানা হাসপাতালের পাশে অবস্থিত প্যাথলজি সেন্টার থেকে। দুদিন পর রিপোর্ট এনে কাকাবাবুকে দেখালেন। কাকার ওয়ার্ধ সেবন করে দিন কয়েকের মধ্যে সজীব বেশ সেরে উঠল। তবে অনেকটা দুর্বল হয়ে পড়ল সে। অনুনয় বিনয় করে দিনে দুবার শিং মাছের বোল দিয়ে ভাত খাওয়ানো হলো। সজীব তার বিপদের কথা তখনো বোঝেনি। মা-বাবার অভাব অনুভব করছে অবশ্যই। দিন পনের স্কুলে যেতে পারেনি। বঙ্গুরা এসে দেখে গেছে। জামুরা, কলা, পেয়ারা, কচি ভাব এনেছে ওরা। সজীব ধীরে ধীরে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠল। আবার স্কুলে যাওয়া শুরু করল।

সজীবের হঠাতে পেট ব্যথার কারণ মূত্রথলের ইনফেকশন। ছোট বয়সের বাচ্চারা এ রোগে বেশি বেশি আক্রমিত হয়। অনেক সময় ইনফেকশন এত তীব্র হয় যে, তলপেটে প্রচও ব্যথা অনুভূত হয়। বমি বমি ভাব বা বমি হয়। ঘন ঘন অন্ধ প্রস্তাব হয়। প্রস্তাবে অত্যন্ত জ্বালা-যত্রণা হয় এবং একসময় প্রস্তাব বক্ষ হয়ে যায়। এ ধরনের সমস্যা অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা প্রয়োজন।

তলপেটের তীব্র ব্যথা, বমি বমি ভাব কিংবা বমি হওয়া ইত্যাদি লক্ষণ থাকে বিধায় অনেক সময় রোগ নির্ণয়ে সমস্যা দেখা দেয়। একিউট অ্যাপেনডিসাইটিস, গোল কুমির আক্রমণ, বদহজম কিংবা অন্ত মুচড়ে যাওয়া ইত্যাদি রোগ হয়েছে এমনটি ধারণা হতে পারে। তবে রোগের সত্ত্বাকার ইতিহাস নিয়ে সঠিকভাবে রোগীর পরীক্ষা করলে এ ধরনের রোগ নিরূপণ করা মোটেই কঠিন কাজ নয়। তবে, কী কারণে মৃত্র সংবহনত্বে এ ধরনের প্রদাহ ও ইনফেকশন হয় তা অবশ্যই খতিয়ে দেখতে হবে। শরীরের অন্যান্য কিছু সমস্যা যেমন: টনসিলের ইনফেকশন, দাঁতের ব্যথা, শ্বাসনালির ইনফেকশন ইত্যাদি রোগ হয়েছে কিনা তা খতিয়ে দেখা উচিত। তাছাড়া প্রস্তাব বের হওয়ার রাস্তা ছোট হয়ে যাওয়া (ফিমোসিস) কিংবা প্রস্তাবের রাস্তায় জন্মগত অন্য কোনো ত্রুটি আছে কিনা তা পরীক্ষা করে দেখতে হবে। অনেক ক্ষেত্রে প্রস্তাবের রাস্তায় পাথর আটকালে বা প্রস্তাবের থলেতে পাথর জমলে এ ধরনের সমস্যা হয়। এর সময়মতো চিকিৎসা করা না হলে ক্রমে ইনফেকশন মৃত্রত্বের উপরিভাগে ও কিডনিতে চলে যায়। ফলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে কিডনির কার্যক্রমে ব্যাঘাত ঘটে, এমনকি কিডনি নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

বাচ্চাদের ঘন ঘন প্রস্তাব হলে, প্রস্তাব লাল বর্ণের হলে, প্রস্তাব করতে জ্বালা-যত্রণা হলে কিংবা প্রস্তাব কম হলে অবশ্যই কিডনি-বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেয়া প্রয়োজন। প্রস্তাব পরীক্ষা, মৃত্রত্বের আলট্রাসনোগ্রাফি এবং প্রয়োজনে অন্যান্য পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে উল্লিখিত ত্রুটিগুলো নির্ণয় করা যেতে পারে। সময়মতো ও উপযুক্ত চিকিৎসার মাধ্যমে এ ধরনের ত্রুটি সারিয়ে তোলা সম্ভব।

পেটের ব্যথা, পেটের অসুখেই হবে, এমন ধারণা অনেক ক্ষেত্রে সঠিক নয়। মৃত্র সংবহনত্বের ইনফেকশন ও প্রদাহের কারণে পেটে হঠাতে ব্যথা হতে পারে। তবে এ ক্ষেত্রে প্রস্তাবের কোনো না কোনো সমস্যা বিদ্যমান থাকে। সুতরাং পেট ব্যথার হঠাতে কারণ অনুসন্ধানে প্রস্তাবের সমস্যা আছে কিনা সেদিকে নজর দিতে হবে। এতে সময়মতো রোগ নিরূপণ সম্ভব হবে এবং রোগের যথাযথ চিকিৎসা ও নিশ্চিত করা যাবে।

সজীবের প্রস্তাবের রাস্তার মাথায় চামড়ার ছিদ্রপথ প্রায় বক্ষ হয়ে গিয়েছিল। একে আমরা ফিমোসিস বলি। ফিমোসিস পুরুষ বাচ্চাদের প্রস্তাবের ইনফেকশন ও মৃত্রত্বের প্রদাহের অন্যতম কারণ। যথাসময়ে খতনা করাই ফিমোসিসের সঠিক চিকিৎসা।

ফিমোসিস কী? এ সমস্কে কিছু আলোকপাত করা দরকার।

পুরুষাদের মাথার চামড়ায় একটা ছিদ্র থাকে। এ চামড়া পেছনে টানলে পুরুষাদের মাথায় প্রস্তাবের রাস্তার ছিদ্র চোখে পড়ে। ফিমোসিস হলে পুরুষাদের চামড়ার ছিদ্র একেবারেই ছোট থাকে বা তা প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। এ চামড়া পেছনে টানলে মৃত্রনলের ছিদ্রপথ দেখা যায় না। ফলে প্রস্তাব বের হতে বাধাপ্রাণ হয় এবং মৃত্রথলেতে তা অনেকাংশে জমে থাকে। ফলে তাতে জীবাণু জন্মে এবং মৃত্র সংবহনত্বের ইনফেকশনজনিত প্রদাহ হয়।

পুরুষাদের মাথার চামড়ায় ইনফেকশনই ফিমোসিসের অন্যতম কারণ। প্রস্তাবের রাস্তার মাথায় ইনফেকশন হলে অবশ্যই ডাঙ্গার দেখিয়ে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে হবে। সঙ্গীবের বেলায় তা-ই করতে হয়েছিল।

দেখতে দেখতে কেটে গেল অনেকগুলো বছর। বার্ধক্যজনিত কারণে মারা গেলেন ঠাকুরমা। সঙ্গীব এখন অনেক বড় হয়েছে। আজ সে অনেক স্বাস্থ্যসচেতন। গেল বছর সরকারি ব্যাংকে বড় পদে চাকরি হয়েছে। এখন মা-বাবা এবং ঠাকুরমার কথা আরো বেশি মনে পড়ে। সে এখন শহরবাসী। তবে গ্রামের মাটির সাথে তার নাড়ির টান। ছুটির দিনে ছুটে যায় গ্রামের বাড়ি। মা-বাবা এবং ঠাকুরমার শাশানে মাথা রেখে চোখের জল ফেলে।

## হঠাতে ব্যথার কারণ-অকারণ



অনেক বছর আগের কথা। মা-বাবার একমাত্র ছেলে টুন্টু। বয়স তেরো। ভারি দুষ্ট। সবেমাত্র অষ্টম শ্রেণীতে উঠেছে। পড়াশোনায় ভালো। মা-বাবা দু'জনেই সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক। ছেলের লেখাপড়ায় তাঁদের নজর আছে। টুন্টু প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষায় ট্যালেন্টপুলে বৃত্তি পেয়ে সবার সুন্দরে পড়েছে। রোজ স্কুল শেষে ঘরে ফিরে তাড়াহড়ো করে খেয়ে বন্ধুদের সাথে খেলতে যায়। ক্রিকেট তার অত্যন্ত প্রিয় খেলা। কখনো ভাবে শটীন হবে, আবার কখনো ওয়াসিম আকরাম। আমগাছের পুরু তঙ্গ দিয়ে ব্যাট বানিয়েছে। টেনিস বলে টেপ মুড়িয়ে বানিয়েছে শক্ত ক্রিকেট বল। ছুটির দিনে সকাল বিকাল ক্রিকেট খেলে।

বাগানে বাগানে গাছের ডালে চড়তে বেশ পটু সে। দেশি ফলের প্রতি তার বেশ আগ্রহ। আম, জাম, আমলকী, আনারস, কাঁঠাল, কলা, পেয়ারা ইত্যাদি ফল তার ভারি পছন্দ। পঞ্চম শ্রেণীর বৃত্তির টাকায় এক জোড়া হাঁস এবং মুরগি কিনেছে। ওদের সে নিয়মিত পরিচর্যা করে। এরা যখন ডিম দেয় তখন তার মন আনন্দে ভরে ওঠে। এভাবে বেশ ভালোই কাটছিল তার দৈনন্দিন জীবন।

শুরু হলো শীতের ছুটি। পড়াশোনার চাপ কম। সবেমাত্র প্রমোশন পেয়েছে। নতুন বই জোগাড় করতে বেশ কষ্ট। বই কিনতে গেলে দোকানে এটা আছে তো ওটা নেই। দামও বেশ চড়া। বাড়ি থেকে দু কিলোমিটার দূরে বড় বাজার। ওখানে বইয়ের বেশ বড়সড় দোকান। বাবার সাইকেল নিয়ে সকালে বের হলো নতুন শ্রেণীর অংক আর ইংরেজি বই কিনবে। নতুন বইয়ের গন্ধ তার বেশ ভালো লাগে।

নষ্ট কেনা হলো। ফেরার পথে বদ্ধ নীতি-প্রসাদকে দেখতে গেল। অন্য কাজও আছে। নীতি তার পরম বদ্ধ। নীতির মা-বাবা টুন্টুকে বিতীয় সন্তানের মতো জানে।

গরম ভাজা মুড়িতে সরিষার তেল মেখে পেঁয়াজ আর কাঁচা মরিচ কুঁচি মিশিয়ে নীতির মা খেতে দিলেন দু'জনকেই। বেশ মজা করে খাচ্ছিল তারা। গরুর দুধের ছানা-মেশানো এক কাপ মিষ্টি চা মরিচের ঝাল নিবারণ করল কিছুটা। খোশ-গল্লে মেতে উঠল দুই বদ্ধ।

হঠাৎ টুন্টু তলপেটের ডান দিকে বেশ ব্যথা অনুভব করল। সাথে ডান দিকের অঙ্কোষেও। বমি বমি ভাব হলো। নীতি তাকে সাইকেলে করে বাড়ি পৌছে দিল। বদ্ধ হঠাৎ অসুস্থ। তাই নীতিরও ভালো লাগছিল না।

ডা. কালাম তখন মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে সার্জারি ওয়ার্ডের মেডিকেল অফিসার। শুক্রবার ছুটির দিন। ডা. কালাম বাড়িতে। টুন্টুর বাবা এসে উনাকে অনুরোধ করে নিয়ে গেলেন তাদের বাড়িতে। ডা. কালাম সবকিছু শনে টুন্টুকে দেখলেন। ওর পেট বেশ নরম, ফোলেনি। টুন্টু একবারও বলেনি তার অঙ্কোষেও ব্যথা। ডা. সাহেবের চিন্তার শেষ নেই। পেটের ব্যথার কারণটা কী! অঙ্কোষের পীড়ায়ও পেটে ব্যথা হতে পারে। অঙ্কোষ দেখার চেষ্টা করলেন। টুন্টু বেশ লাজুক ছেলে। তবে এবার বলেই ফেলল, ‘হ্যাঁ, অঙ্কোষে ভীষণ ব্যথা। ডান দিকেরটা একটু ফুলে গেছে।’

ডাক্তার সাহেবের আর বুরতে দেরি হলো না, ডান দিকেরটা ঘুরে সুচড়ে গেছে। ভারি চিন্তার কথা। খুব জরুরি ব্যাপার। মা-বাবাও বেশ চিন্তায় পড়ে গেলেন। অবস্থা জটিল, হয়তো জরুরি অপারেশনের প্রয়োজন হতে পারে। টুন্টুকে নিয়ে এল শহরের বড় হাসপাতালে। প্রফেসরও দেখলেন। জরুরি অপারেশন লাগবে এমন অভিমত ব্যক্ত করলেন। যথারীতি তাই করা হলো। খুব দ্রুত টুন্টু সুস্থ হয়ে উঠল। সবার চোখে-মুখে আবার হাসি ফুটল।

টুন্টুর হঠাৎ পেটে ব্যথার কারণ পেটের কোনো অসুখ নয়। অঙ্কোষের ডান দিকে অবস্থিত শুক্রাশয় মোছড়ে যাওয়ার ফলেই এ ব্যথা। বিভিন্ন কারণে শুক্রাশয় হঠাৎ মুচড়ে যেতে পারে। সাধারণত কম বয়সের ছেলেরা এ রোগে আক্রান্ত হয় বেশি। শুক্রাশয় মুচড়ে গেলে হঠাৎ করে অঙ্কোষে প্রচও ব্যথা অনুভূত হয়, যা তলপেটে ছড়িয়ে পড়ে। উঠতি বয়সের ছেলেরা লজ্জায় কোষের ব্যথা গোপন রাখার চেষ্টা করে। পেটের ব্যথাটাই বেশি বেশি বলে। ব্যথার সাথে বমি বমি ভাব হয় কিন্তু কোনো কোনো সময় বমিও হয়। আক্রান্ত শুক্রাশয় একটু উপরে চলে আসে এবং উপর দিকে ঠেলে ধরলে ব্যথা আরো বেড়ে যায়। এটা অত্যন্ত জটিল জরুরি সমস্যা।

এ ধরনের ব্যথা অন্যান্য কারণেও হতে পারে। যেমন: অ্যাপেনডিসাইটিস, প্রস্তাবের ইনফেকশন, হঠাৎ পেটে গোল কৃমির আক্রমণ, অঙ্কোষের ইনফেকশন, অঙ্কোষের আঘাত-জনিত ব্যথা, মৃত্রনলের পাথরের ব্যথা ইত্যাদি। তবে ব্যথার

সঠিক ইতিহাস জেনে ও রোগীকে সঠিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে এ রোগ যথাসময়ে নিরূপণ করা সম্ভব। কোনো ক্রমেই রোগ নিরূপণে ভুল বা বিলম্ব করা উচিত নয়। এতে অনেক জটিল সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে। অহেতুক বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার আয়োজন করে কালক্ষেপণ মোটেই শ্রেয় নয়। বিলম্বে শুক্রাশয় মরে নষ্ট হয়ে যায়। ব্যথা শুরুর প্রথম কয়েক ঘণ্টার মধ্যে অবশ্যই অপারেশন করতে হবে। শুক্রাশয় আগের অবস্থানে এনে অওকোষের সাথে ভেতরের দিকে সেলাই করে দিতে হয়। এতে শুক্রাশয় পুনরায় মুচড়ে যায় না। অন্যপাশের ভালো শুক্রাশয়ও ভবিষ্যতে মুচড়ে যেতে পারে। তাই এটাও অওকোষের সাথে সেলাই করে দিতে হয়।

শুক্রাশয় নষ্ট হয়ে গেলে এর অপসারণ প্রয়োজন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে, বিশেষ করে বার-তেরো বছর বা তদুর্ধৰ বয়সের বালকদের এ রোগ হলে ভবিষ্যতে বাচ্চা-কাচ্চা লাভে অনিশ্চয়তা থেকে যায়। এদের একটি শুক্রাশয় মরে গেলে, অন্য শুক্রাশয়ের শুক্রকীট তৈরিতে সমস্যা হয়। ফলে এদের অনেক সময় বাচ্চা-কাচ্চা হয় না এবং সংসার জীবনে অশান্তি নেমে আসতে পারে। টুন্টুর ক্ষেত্রে এ সমস্যা হয়নি। যথাসময়ে রোগ নিরূপণ করে সঠিক চিকিৎসার মাধ্যমে তাকে সারিয়ে তোলা হয়েছে।

সুতরাং অওকোষের হঠাত ব্যথাকে একটি জরুরি সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করতে হবে। অনেক সময় উঠতি বয়সের বাচ্চারা লজ্জায় অওকোষের ব্যথা গোপন রেখে শুধু তলপেটের ব্যথাটাই বর্ণনা করে, যা রোগ নিরূপণে ব্যাঘাত ঘটায়। অন্যভাবে বলতে গেলে, পুরুষদের তলপেটের ব্যথা হলে অবশ্যই অওকোষ ভালোভাবে পরীক্ষা করতে হবে। এমনটিও দেখা যায়, পেট ব্যথার কারণ পেটের কোনো বোগ নয়, বরং অওকোষের শুক্রাশয় মোছড়ে যাওয়ার ফলে উভ্রূত একটি সমস্যা। অনাকাঙ্খিত ভুলের জন্য বড় ধরনের ক্ষতি হতে পারে। তাই হঠাত পেটে ব্যথা হলে অবশ্যই অওকোষ পরীক্ষা করা দরকার।

সুতরাং পেটের হঠাত ব্যথা শুধু পেটের অসুখের কারণেই হয় তা সব সময় সত্য নয়। পেটের বাইরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অসুখের কারণেও পেট ব্যথা হতে পারে। সঠিকভাবে পেটের ব্যথার কারণ নির্ণয় করতে হলে এসব বিষয় অবশ্যই মনে রাখতে হবে। আরো কিছু কিছু অসুখ আছে যার ফলে হঠাত পেটে ব্যথা অনুভূত হতে পারে। যেমন : হার্ট-স্ট্রাকের ব্যথা, ডায়াবেটিস-জনিত সমস্যা, ফুসফুসের ইনফেকশন, বুকে পানি জমা ইত্যাদি। এ সমস্কে জানার দরকার আছে।

টুন্টু এখন বড় হয়েছে। সে দেশের নামকরা মেডিকেল কলেজের শেষ বর্ষের ছাত্র। সহসা ডাঙ্গার হবে। সামনে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। মনে অনেক স্বপ্ন। ঘরে আসবে ফুটফুটে বড়। পত্রে-পুঁজ্পে শোভিত হবে টুন্টুর অনাগত সংসার।

## পেটের সে এক আজব টিউমার



অনেক দিন আগের কথা। মহিলা কলেজে কলা বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষে পড়ত মুন্নজান। হালকা-পাতলা গড়ন, গৌরবর্ণ, মাথায় ঘন কালো দিঘল চুল, সুন্দর হাসি ও মিষ্ঠি মধুর আচরণ সবকিছু মিলিয়ে চমৎকার মেয়ে মুন্ন। মা-বাবা ও দুভাইবোনের সংসারে সবার প্রিয় সে। লেখাপড়ায়ও বেশ ভালো। বড় হয়ে নামকরা আইনজি হবে এমন স্বপ্ন মনে লালন করছিল মুন্নজান। পরিবারের অবস্থা বেশ সচ্ছল। বাবা-ভালো ব্যবসা করতেন। মা সুগৃহিণী। ছোট ভাই স্কুলে পড়ে। পরিবার নয়, যেন এক স্বাজানো বাগান।

মুন্নজান মাঝে মাঝে মাকে তলপেটে মৃদু ব্যথার কথা বলত। উঠতি বয়সে মেয়েদের ঝুতুস্তাবের সময় এমনটি হতে পারে, মা তা-ই মনে করতেন।

একদিন সকাল দশটা। মুন্নজান কলেজে যাওয়ার প্রস্তুতি নিছিল। দুধের প্লাসে চুমুক দিতেই তলপেটে বেশ ব্যথা অনুভব করল। দুধ খাওয়া আর হলো না। ভাবল ব্যথা করে যাবে। রিকশা চড়ে কলেজের পথে রওনা হলো। পথে বড় এক ওষুধের দোকান। ওখানে সকাল বিকাল চেবার করেন ডাক্তার সাহেব। উনার পরামর্শমতো দুটো ট্যাবলেট পানি দিয়ে টুক করে গিলে আবার রওনা হলো কলেজের পথে। ব্যথা কমল না। কলেজ গেটে বান্ধবী রঞ্জার সাথে দেখা। সব খুলে বলল তাকে। কলেজে না গিয়ে রঞ্জা মুন্নকে বাঢ়ি নিয়ে এল।

ব্যথা আরো বেড়ে গেল। মুন্ন বেশ খারাপ লাগছিল। দু-দুবার বমি করল। বাবা এলেন দুপুর দুটোর দিকে। মা বললেন,

‘মহিলা ডাক্তার দরবার’।

এ সময়ে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের চেম্বার বঙ্গ। মুন্নকে নিয়ে শহরের বড় হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে এলেন বাবা। যথারীতি ডাক্তার সাহেব দেখলেন। কিছু জরুরি পরীক্ষা লিখে দিয়ে বললেন, ‘হাসপাতালে ভর্তি করিয়ে দিন’। হাসপাতালের অদূরে বেসরকারি এক ডায়াগনস্টিক সেন্টারে দ্রুতভাবে সাথে মুন্নজানের সব পরীক্ষা-নিরীক্ষা সম্পন্ন করা হলো।

মুন্নজানকে হাসপাতালে ভর্তি না করিয়ে হাসপাতালের কাছেই এক আত্মীয়ের বাসায় নিয়ে আসা হলো। কম্পাউন্ডার এসে হাতের শিরায় স্যালাইন লাগিয়ে দিলেন। মুন্নজান কিছুই খেতে পারছিল না। দু-দুটো ব্যাথানাশক ইনজেকশনেও ব্যথা কমল না। বিকেলে আত্মীয়-স্বজনের পরামর্শে অভিজ্ঞ এক শল্যবিশেষজ্ঞের কাছে নেয়া হলো। সেখানেও একই কথা ‘পরীক্ষা-নিরীক্ষার রিপোর্ট আসুক, তারপর সব ব্যবস্থা করা যাবে।’ সন্ধ্যা সাতটায় সব রিপোর্ট হাতে এল। সার্জনের চেম্বারে নেয়া হলো মুন্নজানকে। শল্য চিকিৎসকের অভিমত, ‘হাসপাতাল বা ক্লিনিকে ভর্তি করিয়ে মহিলা বিশেষজ্ঞের পরামর্শমতো সব করতে হবে’। মা-বাবা, পরিবার-পরিজন সবাই খুব চিন্তায় পড়ে গেলেন। ক্লিনিকে ভর্তি করানো হলো মুন্নকে। সরকারি হাসপাতালের তাৎক্ষণিক চিকিৎসা লাভে খুব একটা ভরসা নেই, এমনটিই ভাবলেন আত্মীয়-স্বজনরা। যথারীতি মহিলারোগ বিশেষজ্ঞ ডাকা হলো। সব দেখেশুনে জরুরি অপারেশনের অভিযন্ত ব্যক্ত করলেন তিনি। সর্বার চিন্তার শেষ নেই। এত ছোট বয়সে পেটে টিউমার! তাও আবার প্যাচ খেয়ে গেছে। জরুরি অপারেশন না হলে খারাপ পরিণতি হতে পারে ইত্যাদি, ইত্যাদি। অপারেশনের আয়োজন করা হলো। সবাই অপারেশন থিয়েটারের সামনে জড়ো হয়ে গভীর উৎকষ্ঠায় কালক্ষেপণ করতে লাগলেন। রাত নয়টায় অপারেশন শুরু হলো। ঘন্টাখানেক পর ওটি থেকে সিস্টার এসে সুসংবাদ দিয়ে গেলেন, অপারেশন সফল হয়েছে। টিউমার অপসারণ করা হয়েছে। তবে আশ্চর্যের বিষয়, টিউমারের ভেতরে এক গোছা কালো চুল এবং তিন তিনটি দাঁতসদৃশ বস্তু। কী অবাক কাও! এ আবার কী ধরনের টিউমার! তাও ছোট মেয়ের পেটে! অনেকে কানাঘুঁঝো করতে লাগল। এ বুঝি জিন-পরীর আছর লেগেছে! আবার কেউবা বলছে, মুন্নজান সুন্দরী। তাকে তাবিজ করা হয়েছে। কত সব কথা! অনেকে তা বিশ্বাসও করলেন।

প্লাস্টিকের এক বড় পাত্রে তা সংরক্ষণ করা হলো। বেশ বড় টিউমার। ছোট একটা ফুটবলের মতো। ভেতরের চুল আর দাঁতগুলো বের হয়ে আসছে। আত্মীয়-স্বজনের চিন্তার শেষ নেই। কেউ কেউ ঝাড়-ফুঁক করা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। পরদিন সকালে দুজন লোক এসে ঝাড়-ফুঁক করলেন। বললেন, ‘এবার সবকিছু বঙ্গ করে দিয়েছি। এসব দুষ্টি লোকের কুদৃষ্টি’।

অতঃপর বড় অংকের টাকা নিয়ে ওরা হাসিমুখে প্রস্থান করল।

যথারীতি সাত-আট দিনে মুন্নজান সুস্থ হয়ে উঠল। সিক-বেডের পাশে চেয়ারে বসে চা খেল। দেয়ালের সাথে সংযুক্ত টেলিভিশনে সদ্যসমাপ্ত জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ফলাফলের খবর দেখল। মুখে তার হাসি। এখন বেশ ভালো অনুভব করছে। শুধু কাটা জায়গাটায় সামান্য একটু ব্যথা—এ আর কি! দিন দশকের মাথায় মুন্নজান সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরল। মা-বাবা গরিব দৃঢ়খিদের অনেক দান-খয়রাত করলেন। সবার মুখে হাসি ফুটল।

মুন্নজানের পেট ব্যথার কারণ ডিষ্বাশয়ের টিউমার। টিউমারটা ক্রমে বড় হয়ে হঠাতে মুচড়ে যাওয়াতে এমন সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে।

ডিষ্বাশয়ের টিউমার সচরাচর পরিলক্ষিত হয় মেয়েদের এমন একটি শারীরিক সমস্যা। এদের আমরা ওভারিয়ান টিউমার বলি। বিভিন্ন ধরনের ওভারিয়ান টিউমার মেয়েদের শরীরে পরিলক্ষিত হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এসব টিউমার পাঁচ-দশ কেজি বা তারও বেশি ওজনের হতে পারে। যৌবনপ্রাণির পরেই সাধারণত এসব টিউমার বেশি পরিলক্ষিত হয়। বিবাহিতা মেয়েদের ক্ষেত্রে তা অনেক বেশি দেখা যায়। এ ধরনের টিউমার হলে পেট ব্যথা ও পেট বড় হয়ে যাওয়া ইত্যাদি লক্ষণ দেখা দেয়। অনেক সময় পেটে বাচ্চা এসেছে বলে মেয়েরা সন্দেহ করে। এ ধরনের সমস্যা হলে অবশ্যই কালবিলম্ব না করে স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেয়া প্রয়োজন।

স্বাস্থ্য-পরীক্ষা ও পেটের আলট্রাসনোগ্রাফি ইত্যাদির মাধ্যমে সঠিকভাবে এ রোগ নির্ণয় করা সম্ভব। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এ ধরনের টিউমার তেমন ক্ষতিকারক নয় এবং এর অপসারণে রোগী সম্পূর্ণ নিরাময় লাভ করে। তবে ক্ষেত্র বিশেষে এ ধরনের টিউমার ক্যাপ্সারের টিউমার হতে পারে। সময়মতো তা নিরূপণ করে সঠিক চিকিৎসা না হলে অতি অল্প সময়ে রোগীর মৃত্যু হয়।

সাধারণত বয়স্ক রোগীদের ক্ষেত্রে ক্যাপ্সারজাতীয় টিউমার বেশি পরিলক্ষিত হয়। এ ক্ষেত্রে অতি অল্প সময়ে পেটে বেশ পানি জমে ও পেট বড় হয়ে যায়। খাদ্যে অরূপি হয়। শরীর শুকিয়ে যায়। শরীরে রক্ত কমে যায়। সেই সাথে ওজন অস্বাভাবিকভাবে কমে যায়। অনেক সময় পেট এত বড় হয় যে রোগীর শ্বাস-প্রশ্বাসে কষ্ট হয়। এ ধরনের সমস্যা হলে দ্রুত স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেয়া প্রয়োজন। বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা যেমন : পেটের পানি পরীক্ষা, পেটের সিটি ক্যান, টিউমার থেকে বায়োপ্সি নেয়া ইত্যাদির মাধ্যমে সহজেই এ রোগ নিরূপণ সম্ভব। তবে রোগ ছড়িয়ে পড়লে চিকিৎসায় সাফল্য লাভের সম্ভাবনা কম। তাই এ ধরনের জটিলতা সৃষ্টির আগেই যথাযথ ব্যবস্থা নেয়া বাধ্যনীয়।

অনেক সময় ডিষ্বাশয়ের টিউমার অপসারণের সময় ডিষ্বাশয় ও জরায় উভয়ই অপসারণ করতে হয়। নতুন ভবিষ্যতে এসবের ক্যাপ্সার হওয়ার ঝুঁকি থেকে যায়। অনেক সময় এ ধরনের টিউমারের ফলে হঠাতে পেটে ব্যথা হলে অ্যাপেনডিসাইটিস,

তলপেটের ইনফেকশন, মূত্রনালির পাথর ইত্যাদি রোগ সন্দেহ করা হয়। তবে রোগের সঠিক ইতিহাস জেনে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে সঠিক রোগটি নিরূপণ করা সম্ভব।

মুন্নজানের তলপেটের টিউমারটি অন্য ধরনের। এ ধরনের টিউমারকে আমরা ডারময়েড বলি। এ টিউমার হঠাৎ মুচড়িয়ে যেতে পারে। ফলে পেটে হঠাৎ প্রচও ব্যথা অনুভূত হয়। চামড়ার কলা বা টিস্যু থেকে তৈরি হয় বলে এর ভিতর চুল, দাত, হাঁড়, পেস্ট জাতীয় পদাৰ্থ তৈরি হতে পারে। এটা কোনো অভিশাপের কারণে নয়। টিউমারটির ধরনটাই ঐ রুকম। কোনো তাবিজ, জিন-পরীর আছর কিংবা কারো অভিশাপে এখনটি হয় তা মনে করার কোনো গৌত্তিকতা নেই। এটা এ রোগের স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। এ ধরনের টিউমার নিয়ে অনেক সময় পরিবার, সমাজ বা বৈবাহিক জীবনে সমস্যা সৃষ্টি হয়। যা মোটেই কাম্য নয়। এসব টিউমার সাধারণত অজানা কারণে সৃষ্টি হয়ে থাকে। এগুলো ক্যাসারজাতীয় টিউমার নয় বা ক্যাসারে ঝুপান্তরিতও হয় না। এর অপসারণে রোগী সম্পূর্ণ সুস্থ হয়। বৈবাহিক জীবনে বা গর্ভধারণেও সাধারণত কোনো ধরনের জটিলতার সৃষ্টি হয় না। সুতরাং টিউমারের ভেতরে চুল বা দাঁত থাকলে অহেতুক আতঙ্কিত হওয়ার কোন কারণ নেই।

মুন্নজান খুব ভালো মেয়ে। তার পেটের টিউমার অপসারণ করা হয়েছে। সে এখন রোগমুক্ত। বছর-তিনেক হয় তার বিয়ে হয়েছে। ফুটফুটে এক পুত্রসন্তান তার সংসারকে আলো আর হাসিতে মাত্রিয়ে রেখেছে।

## নিজামউদ্দিনের পিতৃশূল



নিজামউদ্দিন রজনীকান্তের ছোটবেলাকার পরম বন্ধু। গ্রামের একই বিদ্যালয়ে একসাথে লেখাপড়া করেছেন অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত। দুজনেই ছিলেন গরিব ঘরের সন্তান। জ্যোতির্ময় একান্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন দুজন। যুদ্ধ শেষে রজনীকান্ত ফিরে এলেন নিজ গ্রামে। নিজাম সাহেবের অনেক খোঁজখবর নিয়েছেন। কেউ কিছুই বলতে পাবলো না।

অনেক কষ্টে রজনীকান্ত নিজের পায়ে দাঁড়ালেন। ছোটখাটো একটা গার্মেন্টস ব্যবসা খুললেন। একদিন ঢাকায় এক আত্মীয়ের বিয়েতে দুজনের দেখা হয়ে গেল। একে অপরকে চিনতে এতটুকুও ভুল হয়নি। আবেগে জড়িয়ে ধরে কাঁদলেন দুজনে। তারপর ওর হলো দুজনার মাঝে যত সব কথা। অনেকগুলো বাছরের জমিয়ে রাখা অফুরন্ত সব কথা যেন স্রোতশ্বিনী পদ্মার মতো বেরিয়ে আসতে চাইল। খাসির কোরমা, মুরগির রোস্ট, সুস্বাদু বিরিয়ানি, বড় চিংড়ির ফ্রাই অতুলনীয় স্বাদের ব্যঙ্গন মাতিয়ে তুলল দুজনার খোশগাল্লের আসর। তারপর?

হঠাৎ নিজাম সাহেবের মুখ কালো হয়ে গেল। গল্প থেমে গেল। রজনীবাবু সবই লক্ষ করলেন। নিজাম সাহেব পেটের ডান দিকের উপরিভাগে প্রচণ্ড ব্যথা অনুভব করলেন। সাথে সাথে খাবার টেবিল থেকে উঠে নিজের গাড়ি করে তাকে নিয়ে গেলেন বাড়ির পাশে এক আধুনিক হাসপাতালে। ততক্ষণে ব্যথা আরো বেড়ে গিয়ে বুকের পেছনে ও ডান দিকের ঘাড়ে ছড়িয়ে পড়ল। অনেক বার বমি ও হলো। খুব খারাপ লাগছিল নিজাম সাহেবের। মোবাইলে তার অসুস্থতার কথা শনে

আত্মীয়-স্বজনরা আসতে লাগল। বেশ কয়েকজন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার পর্যায়ব্রহ্মে দেখে রোগ নিরূপণ করলেন— পিণ্ডথলের পাথরজনিত প্রদাহ।

নিজাম সাহেব বহু বছর ধরে বহুমূত্র ও উচ্চ রক্তচাপ রোগে ভুগছেন। নিয়মিত ইনসুলিন ও উচ্চ রক্তচাপের ঔষধ সেবন করছেন। ডাক্তার সাহেব এসব রোগের দিকে যথাযথ নজর রেখেই চিকিৎসার ব্যবস্থা করলেন। সঙ্গাহ-খানেক খাওয়াদাওয়া বন্ধ ছিল। শিরায় স্যালাইন ও অন্যান্য চিকিৎসা নিতে হয়েছে। প্রায় দশদিন অনেক কষ্ট পেয়ে নিজাম সাহেব কিছুটা সেরে উঠলেন। হাসপাতাল ত্যাগের সময় ছাড়পত্রে ডাক্তার সাহেব মাস দেড়েক পরে পিণ্ডথলের পাথর অপসারণের জন্যে হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পরামর্শ দেন।

নিজাম সাহেবের যে রোগ হয়েছিল তার নাম আকস্মিক পিণ্ডথলের পাথরজনিত ইনফেকশন। পিণ্ডথলের পাথর তৈরি হতে বেশ সময় লাগে। তবে পিণ্ডথলের প্রদাহ হঠাত হতে পারে। এ বিষয়ে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করছি।

আলোচনার শুরুতে পিণ্ডরসের উৎপত্তি, পরিবহন ও সংঘালন, কার্যকারিতা ইত্যাদি বিষয়ে সংক্ষেপে আলোকপাত করার চেষ্টা করবে।

পিণ্ডরস, যকৃৎ থেকে বের হয়ে যে পথে শুন্দ্রান্ত্রে আসে সে পথ বা নালিকে আমরা পিণ্ডনালি বলি। এ নালির সাথে সংযুক্ত হয়ে ডান দিকে যকৃতের নিচে থাকে একটা ছোট্ট থলে, যাকে আমরা পিণ্ডথলে বলি। পিণ্ডথলে সাময়িকভাবে পিণ্ডরস সম্ভব্য করে রাখে ও একে ঘনীভূত করে। চর্বিজাতীয় খাদ্য গ্রহণের পরপরই এ পিণ্ডরস শুন্দ্রান্ত্রে নিঃসৃত হয় যা চর্বিজাতীয় খাদ্য পরিপাকে যথেষ্ট সহায়তা করে। সুতরাং এটা প্রতীয়মান যে পিণ্ডথলে ও পিণ্ডনালির গুরুত্বপূর্ণ কাজ রয়েছে।

প্রশ্ন আসা স্বাভাবিক, পিণ্ডথলে ও পিণ্ডনালিতে প্রদাহ ও পাথর হয় কেন? কোথা থেকে এসবের উৎপত্তি? পিণ্ডরসে কোলেস্টেরল বাঢ়তি হলে বা পিণ্ড লবণের ঘাটতি হলে পিণ্ডথলেতে পাথর জমে। তাছাড়া পিণ্ডথলের কার্যকারিতা শুরু হলে বা পিণ্ডথলেতে কোনো কারণে ইনফেকশন হলে পিণ্ডথলেতে পাথর জমে। এ ছাড়া রক্তের লোহিত কণিকা অধিক মাত্রায় ভঙ্গুর হলেও পিণ্ডথলে এবং পিণ্ডনালিতে পাথর জমতে পারে। সাধারণত মধ্যবয়সের ফর্সা নারীদের পিণ্ডথলের পাথর রোগ বেশি দেখা যায়। তবে যুবক, যুবতী বা মধ্যবয়সের পুরুষদেরও এ ধরনের পাথর হতে পারে। একেবারে বুড়ো বয়সী লোকদের পিণ্ডথলের পাথরের রোগ কম পরিলক্ষিত হয়। বাচ্চাদের পিণ্ডথলেতে বা পিণ্ডনালিতে পাথর হলে তাদের জন্যগত কোনো ক্রিটি বা রক্তের মাত্রাধিক ভঙ্গুরতা-দোষ আছে এমনটি ধারণা করতে হবে। গরিবদের তুলনায় বিশ্বালীদের এ রোগ বেশি দেখা যায়। পিণ্ডথলে অথবা পিণ্ডনালিতে পাথর হলে বিভিন্ন সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে যা মৃত্যুবুকি রূপেও দেখা দিতে পারে। তাই পিণ্ডথলের ও পিণ্ডনালির পাথর অপসারণ অপরিহার্য।

পিণ্ডথলেতে পাথর হলে পিণ্ডথলের প্রদাহ হয়। এ ছাড়া পিণ্ডথলের পচন ধরা, পিণ্ডথলেতে পুঁজ জমা, পিণ্ডথলে ফুটো হয়ে যাওয়া ইত্যাদি মারাত্মক সমস্যাও দেখা

দিতে পারে। অনেক সময় পাথর পিণ্ডথলে থেকে বের হয়ে পিণ্ডনালির পথ বন্ধ করে দেয়। ফলে পিণ্ডনালির ইনফেকশন হয় এবং জড়িস দেখা দেয়। এমনকি পিণ্ডথলে ফুটো হয়ে পাথর নিকটবর্তী অঞ্চে প্রবেশ করে অঙ্গের পথ বন্ধ করে দেয়। পিণ্ডথলের ইনফেকশন অথবা জড়িস এমন পর্যায়ে পৌছতে পারে যা জীবনের জন্য অস্মিক হয়ে দেখা দেয়। আবার কখনোবা অনেক বছর ধরে পিণ্ডথলের পাথর একেবারে নীরব অবস্থায় থাকে। কোনো কোনো রোগীর ক্ষেত্রে শরীরের অন্য কোনো অসুখের জন্যে আলট্রাসনেগ্রাফি করালে এ ধরনের পাথর ধরা পড়ে। পিণ্ডথলেতে পাথর অনেক বছর ধরে থাকলে পিণ্ডথলের ক্যাসার হতে পারে। সুতরাং পিণ্ডথলেতে বা পিণ্ডনালিতে পাথর হলে তা অপসারণ আবশ্যিক।

এখন আমরা সংক্ষেপে আলোচনা করব পিণ্ডথলে ও পিণ্ডনালিতে পাথর হলে কী কষ্ট হয় এবং কীভাবে তা নিরূপণ করে একটা সহজ ও ফলপ্রসূ চিকিৎসা-পদ্ধতি নির্ধারণ করা যায়।

পিণ্ডথলেতে পাথর হলে সাধারণত তৈলাক্ত খাদ্য গ্রহণের পর পেটে ব্যথা হয়। ব্যথা উপশমের ওমুধ খেলে দু-একদিনে তা সেরে যায়। তবে অনেক সময় পাথরের উপস্থিতির কারণে পিণ্ডথলেতে বিভিন্ন রোগ-জীবাণু বৎশ বিস্তার করে। ফলে পিণ্ডথলের প্রদাহ হয়। এমতাবস্থায় ব্যথা বেড়ে যায় এবং সাধারণত এই ব্যথা পেটের ডান দিকে উপরিভাগে অনুভূত হয়। ক্রমেই ব্যথা বুকের পেছনে, ডান ক্ষক্ষে ও পেটের অন্যান্য স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। কখনো কখনো পেটের ডান দিকে উপরিভাগ শক্ত হয়ে যায় এবং এই জায়গায় চাক অনুভূত হয়।

রোগের সঠিক ইতিহাস সংগ্রহ করে রোগীকে যথাযথভাবে পরীক্ষা করা দরকার। এ অবস্থা সৃষ্টির শুরুতে রোগীকে হাসপাতালে ভর্তি করিয়ে বেশ কয়েক দিন মুখে খাদ্য ও পানীয় বন্ধ করে দিতে হয়। শিরার মাধ্যমে পানি, লবণ, অ্যান্টিবায়োটিক ইত্যাদি প্রয়োগ করতে হয়। সাধারণ এক্স-রের সাহায্যে শতকরা পঁচাশি ভাগ ক্ষেত্রে পিণ্ডথলের কিংবা পিণ্ডনালির পাথর নির্ণয় করা সম্ভব নয়। তবে আলট্রাসনেগ্রাফি কিংবা ক্ষেত্রবিশেষে অন্যান্য আধুনিক পরীক্ষার মাধ্যমে অবশ্যই তা নির্ণয় করা সম্ভব। এমতাবস্থায় পাথর অপসারণে অনেক জটিলতার সৃষ্টি হতে পারে। সুতরাং অবস্থা কিছুটা স্বাভাবিক হলে ল্যাপারোক্সোপির সাহায্যে কিংবা অপারেশনের মাধ্যমে পিণ্ডথলের পাথর বের করে আনা সম্ভব। ল্যাপারোক্সোপির মাধ্যমে পেটে কয়েকটা ছোট ছোট ফুটো করে পিণ্ডথলেসহ পাথর অপসারণ করা হয়। শতকরা আটানবই ভাগ রোগীর ক্ষেত্রে ল্যাপারোক্সোপির মাধ্যমে পিণ্ডথলের পাথর অপসারণ সম্ভব। কোন রোগীকে কোন পদ্ধতিতে চিকিৎসা করলে সুফল আসবে চিকিৎসক তা নির্ধারণ করেন। ল্যাপারোক্সোপিক অপারেশনের জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণের প্রয়োজন।

আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে পাথরজনিত কারণে পিণ্ডথলেতে শ্বেঘাজাতীয় পদার্থ জমে। এ ধরনের রোগে ডান দিকে পেটের উপরিভাগে ব্যথা ও ভারী ভারী

ভাব অনুভূত হয়। অনেক সময় ডান দিকে বুকের নিচে টিউমারের মতো চাক মনে হয়। ল্যাপারোকোপির মাধ্যমে এ রোগ সম্পূর্ণ নিরাময় সম্ভব। পিন্ডনালির পাথর পিন্ডরস অন্তে যাওয়ার পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। ফলে পিন্ডনালি ফুলে যায়। পিন্ডনালিতে ইনফেকশন হয়। পিন্ডরস বের হতে না পারায় জড়িস দেখা দেয়। এ অবস্থায় পেটের ডান দিকে প্রচণ্ড ব্যথা হয়, কাঁপুনি দিয়ে জুর আসে। গায়ে চুলকানি হয় ও পায়খানা মেটো রঙের হয়। আলট্রাসনোগ্রাফির মাধ্যমে সহজে পাথরের অবস্থান নিরূপণ করা যায়। ইআরসিপি নামক এক বিশেষ পদ্ধতিতে এ রোগ যেমন নিরূপণ করা যায়, তেমনি অধিকাংশ ক্ষেত্রে অপারেশন ছাড়া এ পদ্ধতিতে পিন্ডনালির পাথর বের করে আনা সম্ভব। বর্তমানে এ পদ্ধতি আমাদের দেশের বিভিন্ন হাসপাতালে চালু রয়েছে। আর্থিক দিক বিবেচনা করলে খরচও কম। তবে এ ধরনের পদ্ধতি প্রয়োগের জন্যে ভালো প্রশিক্ষণের প্রয়োজন।

জেনে রাখা ভালো, বয়কদের ক্ষেত্রে জড়িস, গায়ে চুলকানি, পেটে ব্যথা, মেটো রঙের পায়খানা ইত্যাদি উপসর্গ অগ্ন্যাশয় কিংবা পিন্ডনালির ক্যাসারের কারণেও হতে পারে। রোগের সঠিক ইতিহাস সংগ্রহ করে বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা যেমন : সিটি স্ক্যান, বায়োলি ইত্যাদির মাধ্যমে এ রোগ সঠিকভাবে নির্ণয় করা সম্ভব। প্রাথমিক অবস্থায় এ রোগ নিরূপণ করে সঠিক চিকিৎসা নিশ্চিত করতে পারলে ভালো ফল আশা করা যায়। নতুনা কয়েক মাসের মধ্যে রোগীর মৃত্যু ঘটে।

ওযুধের মাধ্যমে বা মেশিনের সাহায্যে পিন্ডথলের বা পিন্ডনালির পাথর গলানো সম্ভব কিনা এ সম্বন্ধে অনেক জিজ্ঞাসা থাকতে পারে। তেমন কার্যকর নয় বিধায় বর্তমানে এ ধরনের পদ্ধতির প্রচলন নেই। অতএব, প্ররোচিত না হয়ে বর্ণিত চিকিৎসার ওপর নির্ভর করা ভালো। আবার অনেকের এমনও প্রশ্ন, পাথরের সাথে পিন্ডথলে ফেলে দিলে শরীরের কোনো ক্ষতি হয় কিনা! পিন্ডথলেতে পাথর হলে পিন্ডথলে তার স্বাভাবিক কাজ করে না। তাই বারবার তাতে ইনফেকশন হয় এবং পাথরের সংখ্যা বাঢ়তে থাকে। পিন্ডথলের পাথর অপসারণের পর কয়েক মাস সহজপাচ্য খাওয়া ভালো।

মনে রাখা দরকার ডান পেটের উপরিভাগে ব্যথা অন্যান্য কিছু রোগ, যেমন: পাকস্থলী ও ডিওডেনামের ঘা, অগ্ন্যাশয় কিংবা যকৃতের প্রদাহ, বৃহদস্ত্রের ক্যাসার, গোল কুমির আক্রমণ, বৃক্কের পাথর ইত্যাদিতেও হতে পারে। এ ক্ষেত্রে রোগের সঠিক ইতিহাস ও প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা অবশ্যই রোগ নির্ণয়ে সহায়ক।

পিন্ডথলের পাথর একটি সাধারণ শারীরিক সমস্যা। সঠিক সময়ে এ রোগ নিরূপণ করে সঠিকভাবে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হলে খুব ভালো ফল আশা করা যায়। কোনো জটিলতা সৃষ্টির আগে অবশ্যই পাথর অপসারণ করতে হবে।

পিন্ডথলের পাথর অপসারণের জন্যে ল্যাপারোকোপি একটা আধুনিক ও কার্যকর পদ্ধতি। শতকরা আটানবই ভাগ ক্ষেত্রে এর সফল প্রয়োগ সম্ভব। এতে

অপারেশন-জনিত বিভিন্ন জটিলতার সম্ভাবনা থাকে না। কাটা দাগ খুব একটা দেখা যায় না। পাথর অপসারণের পর স্বল্পতম সময়ে স্বাভাবিক কাজ কর্মে ফিরে যাওয়া সম্ভব। তাই এ পদ্ধতি বর্তমানে বহুল প্রচলিত।

আমাদের দেশের বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালে বর্তমানে কম খরচে অত্যন্ত সফলতার সাথে এ ধরনের আধুনিক পদ্ধতিতে পিণ্ঠথলের পাথর অপসারণ করা হচ্ছে। এ ধরনের রোগীদের জন্য তা বড় সুসংবাদ।

নিজাম সাহেব বছর চারেক পিণ্ঠথলের অসহ্য পাথর যন্ত্রণায় কষ্ট পেয়েছেন। অনেকবার তা অপসারণের জন্যে চিন্তা করেছেন। কিন্তু তার অচেল সম্পদের চিন্তা-ভাবনা তাকে পিণ্ঠটান দিয়েছে। অপারেশনে মৃত্যুভয়, অজ্ঞান করলে জ্বান ফিরবে কিনা ইত্যাদি দুশ্চিন্তা করে অপারেশনে রাজি হননি তিনি। বঙ্গ রজনীকান্ত তাকে অনেক বোৰানোর পর অপারেশনে রাজি হন। গেল বছর দেশের এক হাসপাতালে ল্যাপারোক্সেপি যন্ত্রের সাহায্যে তার পিণ্ঠথলের পাথর অপসারণ করা হয়েছে। এখন পিণ্ঠশূল আর নেই। চোখে-মুখে তার অনবিল আনন্দের ছবি।

## নয়নের চোখে ডাক্তার হবার সোনালি স্বপ্ন



তৈয়াব-তসলিমার একমাত্র কল্যান। আসছে ফেরুজ্যারিতে ঘোলতে পা গাখবে। নয়নের বয়স যখন দু বছর, বাবা তৈয়াব আলী পাড়ি জমালেন মধ্যপ্রাচ্যে, টাকার সঙ্কালন। দেখতে দেখতে কেটে গেল তেরটি বছর। মাঝে বারকয়েক দেশে এসে পরিবারের সাথে ছিলেন। নয়ন তাদের একমাত্র আদুরে সন্তান। মাস ছয় আগে নয়নের মাঝের পেটে অপারেশন হয়েছে। তলপেটে টিউমার। টিউমারের সাথে জড়ায় কেটে বাদ দেয়া হয়েছে। নয়নের আর ভাই-বোন হবে না।

নয়নদের পরিবার আজ অনেক সচ্ছল। বদলে গেছে তাদের সামাজিক অবস্থানও। পাকা ঘর, জমিজমা, বড় পুকুর সবই কেনা হয়েছে বাবার রোজগারে। নয়নকে ধিরে মা-বাবার কত স্বপ্ন। মেঝেকে বড় ডাক্তার বানাবে।

আগামী গ্রীষ্মে এসএসসি দেবে নয়ন। চার চারজন অভিজ্ঞ শুলশিক্ষক উঁচু-বেতনে নয়নের লেখাপড়ার তত্ত্বাবধানে নিয়োজিত। নয়নের বাবা প্রায়ই শিক্ষকদের জন্যে মধ্যপ্রাচ্য থেকে বিভিন্ন গিফ্ট পাঠান। সময়ে-অসময়ে সবার সাথে কথা বলেন মোবাইল ফোনে। ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়েও আলাপ করেন। নয়ন বড় হয়ে ডাক্তার হবার স্বপ্ন দেখে।

মাস কয়েক আগের কথা। স্কুলশিক্ষক অংকের কঠিন একটা অনুশীলনী সমাধান করছেন। নয়নকে ধিরে স্কুলশিক্ষকদের অনেক আশা। অন্যদিনের মতো আজ তেমন মনোযোগী নয় নয়ন। মুখখানা যেন অমাবস্যার রাত। অনেক কঠো ক্লাস শেষে বাবার কেনা লাল সিএনজি করে বাড়ি ফিরল। বইখাতা রেখে বিছানায়

তয়ে পড়ল। কিছুই ভালো লাগছে না। ডানদিকে তলপেটে বেশ ব্যথা হচ্ছে। গেল  
মাসেও এই ধরনের খারাপ লেগেছিল। বারবার ধাম্য ডাঙ্গার অনিল বাবুর ওষুধ  
খেয়ে সেরে উঠেছে। এবার ব্যথা অনেক বেশি। বমির ভাবও হচ্ছে।

মাইল দুই দূরত্বে ডাঙ্গার অনিল বাবুর চেম্বার। বছর পাঁচেক আগে অনিল বাবু  
পল্লী চিকিৎসা কোর্স শেষ করে মন্ত বড় ওষুধের দোকান খুলে চিকিৎসাশাস্ত্র চর্চা  
শুরু করেছেন। দোকান কেনার সময় নয়নের বাবার কাছ থেকে এক লক্ষ টাকা ধার  
নিয়েছেন। ইতিমধ্যে অর্ধেক পরিশোধও করেছেন। অনিল বাবুর ব্যবহার বেশ  
মিষ্টি। রোগীর প্রতি যত্ন ও ওষুধ ব্যবসায় সততার কারণে এলাকার মানুষের মন  
জয় করেছেন। নয়নের পেট ব্যথা সারতে এবারও অনিল বাবু এগিয়ে এলেন।  
ট্যাবলেট ক্যাপসুল থাইয়ে দিলেন নয়নকে। ব্যথা তেমন কমে না। এবার  
শল্যচিকিৎসকের শরণাপন হওয়ার পরামর্শ দিলেন। ভাবলেন, অ্যাপেনডিসাইটিস  
হয়েছে। চক্রিশ-আটচল্রিশ ঘণ্টার মধ্যে অপারেশন দরকার।

নয়নকে শহরে নিয়ে আসা হলো। শল্যচিকিৎসকের পরামর্শের জন্য সিরিয়াল  
নেয়া হলো। বিদেশে বাবার সাথে ফোনে কথা হয়েছে। বাবা বলেছেন, ‘অনিলের  
পরামর্শমতো সব করো’।

দুপুর গড়িয়ে সক্কা নামল। অপেক্ষার বুঝি শেষ নেই।

রাত তখন আটটা। শল্যচিকিৎসক এলেন। নয়নকে দেখলেন। দু-চারটা টেস্ট  
লিখে বললেন, ‘হাসপাতালে ভর্তি করিয়ে দিন, রিপোর্ট এলে বুঝে-গুনে ব্যবস্থা  
নেয়া যাবে। তড়িঘড়ির কিছুই নেই।’

নয়নকে যথারীতি ক্লিনিকে ভর্তি করানো হলো। খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করে হাতে  
স্যালাইন দেয়া হলো। নেয়া হলো প্যাথলজি সেন্টারে। সবগুলো টেস্ট দ্রুত সম্পন্ন  
হলো। রিপোর্ট মিলবে পর দিন সকালে। ডাঙ্গার সাহেব আসবেন। সব দেখে-গুনে  
সিদ্ধান্ত দেবেন।

সবার অপেক্ষার বুঝি শেষ নেই। মা, মামা, খালার চিন্তার শেষ নেই। নয়নের  
যদি অপারেশন লাগে! নয়ন সুস্থ হবে তো! অপারেশনের দাগটা কি খুব বেশি দেখা  
যাবে! বিয়েতে ঝামেলা হবে না তো। ভবিষ্যতে মা হতে পারবে কিনা ইত্যাদি,  
ইত্যাদি।

সবার রাত কাটল শঙ্কা আর দুশ্চিন্তায়। খুব সকালে ডাঙ্গার এলেন। রিপোর্ট  
দেখলেন। ততক্ষণে নয়নের পেটের ব্যথা বেশ কমে গেছে। ডাঙ্গার বললেন,  
অপারেশনের প্রয়োজন নেই। নয়ন খুব সহসা বাঢ়ি যেতে পারবে। নয়নের মা  
কপালের ধাম মুছলেন। অমাবস্যার রজনী বুঝি শেষ হলো। নতুন সূর্যের আলোকে  
চারদিক উদ্ভাসিত হলো। নয়নের মুখে হাসি ফুটল। মোবাইল ফোনে বাবার সাথে  
কথা হলো। বলল, ‘বাবা আমি খুব ভালো আছি, ঈদে অবশ্যই বাঢ়ি এসো’।

বিকেলে নয়ন হাসপাতাল থেকে ছাড়পত্র নিয়ে বাঢ়ি ফিরল। সবাই আজ খুব  
খুশি। খরচের অংক তেমন আমলে নেয়নি কেউ।

নয়নের কী অসুখ হয়েছিল। তার পেট ব্যথার কারণটাই বা কী এসব জানা দরকার।

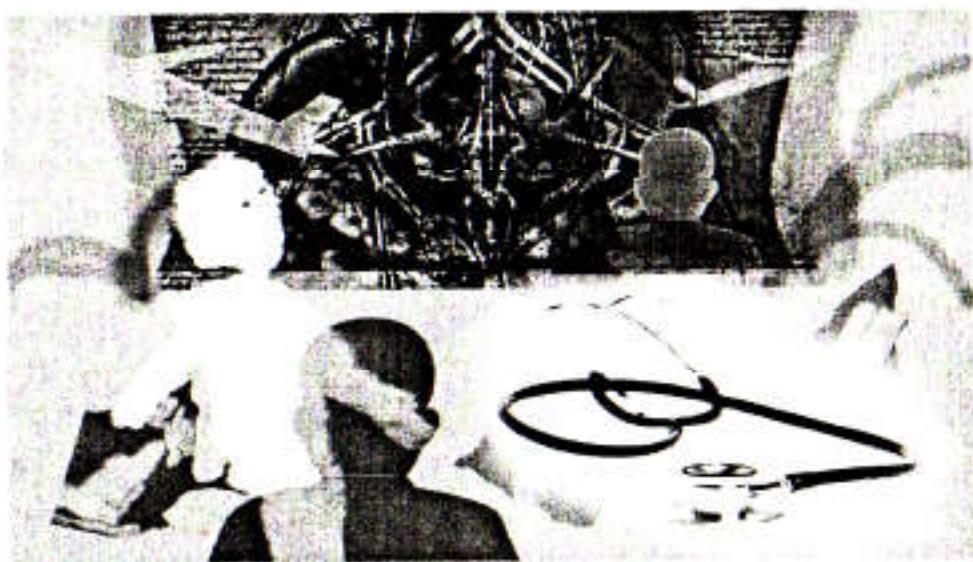
নয়ন ঘোবনে পা রেখেছে। বছর তিন ধরে তার নিয়মিত ঝর্তুস্রাব হয়। ঝর্তুস্রাব ভবিষ্যতে মা হওয়ার বার্তা বহন করে। প্রতিমাসে ঝর্তুস্রাবের দশ-বারোদিন আগে মেয়েদের ডিম্বাশয় থেকে ডিম্বকোষ বের হয়। বিবাহিত জীবনে এ ডিম্বকোষ স্বামীর শুক্রকীটের সাথে মিলিত হয়ে ভ্রং তৈরি করে। আর তা বড় হয়ে পরিণত শিশুর রূপ নেয়। এটা স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিক নিয়ম। অনেক সময় ডিম্বাশয় থেকে ডিম্বকোষ বের হওয়ার মুহূর্তে পেটে ব্যথা হয়। কেউ কেউ তা একটু বেশি অনুভব করে। একে আমরা অভ্যন্তরে পেইন বলি। এটা কোনো রোগ নয় বরং ঘোবনে নারীর শরীরের স্বাভাবিক আচরণ। অনেক সময় ব্যথা একটু বেশি হলে, বিশেষ করে তা ডানদিকে তলপেটে অনুভূত হলে, অ্যাপেনডিসাইটিসের ব্যথার মতো মনে হতে পারে। খুব মনোযোগ সহকারে ব্যথার বিবরণ ও অন্যান্য উপসর্গের তথ্য বিশ্লেষণ করলে এর কারণ নির্ণয়ে ভুল হওয়ার কথা নয়।

অ্যাপেনডিসাইটিসের ব্যথা সাধারণত পেটের মাঝখানে শুরু হয়, পরবর্তীতে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে তা তলপেটের ডানদিকে চলে যায়। খাওয়ার রুটি কমে যায়। বমির ভাব বা বমি হয়। গায়ে জুর আসে। অভ্যন্তরে পেইন মাসের তৃতীয় সপ্তাহে হয়। কখনো তলপেটের ডান দিকে, আবার কখনোবা বামদিকে অনুভূত হয়। গায়ে জুর থাকে না। খাদ্যে অরুচি হয় না। সন্দেহ হলে সাধারণ পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে সঠিক ধারণা নেয়া সম্ভব।

সাধারণত কম বয়সের মেয়েদেরই অভ্যন্তরেজনিত ব্যথা অনুভূত হয়। কোনো অবস্থাতেই অভ্যন্তরে পেইনকে অ্যাপেনডিসাইটিসের পেইন মনে করে তাড়াহড়ো করে অপারেশনের সিদ্ধান্ত নেয়া উচিত নয়। এতে রোগীর অনেক ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। ক্ষেত্রবিশেষে মহিলারোগ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেয়া যেতে পারে।

সুন্দর ও সঠিক চিকিৎসাসেবা সব রোগীরই কাম্য। ডাক্তার সাহেব সঠিক চিকিৎসাই দিয়েছেন। নয়ন ডাক্তার সাহেবের খুব প্রশংসন করে। ভবিষ্যতে বড় ডাক্তার হওয়ার সোনালি স্বপ্ন দেখে সে।

## এখন সময় ভাববার



দীর্ঘ বার ঘন্টা আকাশপথে ক্লান্তিময় যাত্রা শেষে চট্টগ্রাম আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করলেন বিন্দু গ্রামের বনেদি বাসিন্দা তমিজউদ্দিন। চোখে-মুখে বেদনার কালো ছায়া। একশ ডলার বকশিশ দিয়ে তড়িঘড়ি করে বড় চারটে স্যুটকেস নিয়ে সবার আগে এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে এলেন। বাইরে আত্মীয় স্বজন সকাল অবধি দু-দুটো বড় মাইক্রোবাস নিয়ে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন। এসেই বেদনাজড়িত কঢ়ে বললেন, ‘আমাকে ক্লিনিকে নিয়ে চল, আমি আর সইতে পারছি না।’ আত্মীয়স্বজন কিংকর্তব্যবিমৃঢ়। বিদ্যুৎ বেগে গাড়ি চালিয়ে তমিজউদ্দিনকে শহরের এক ক্লিনিকে নিয়ে আসা হলো। জরুরিভাবে বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দরকার। পেটের অসহ্য ব্যথায় কাতরাচ্ছন তমিজউদ্দিন।

রাত তখন বারোটা। এ সময়ে বিশেষজ্ঞ ডাক্তার পাওয়া! অনেক চেষ্টার পর ক্লিনিকের কর্তব্যরত ডাক্তার মৃদু হেসে বললেন, ‘কথা হয়েছে, ডাক্তার আসছেন’। বিকট শব্দে হৰ্ণ বাজিয়ে অ্যাম্বুলেন্স ধেয়ে এল। রাত দুটোয় বিশেষজ্ঞ ডাক্তার আসলেন। তমিজউদ্দিনকে পরীক্ষা করে বললেন, ‘ইনভেস্টিগেশন লাগবে’। ব্যথা আর ঘুমের ইনজেকশন লিখে দ্রুত প্রস্তান করলেন।

পরদিন সকালে আবার এলেন। অপারেশনের সিদ্ধান্ত দিলেন। যথারীতি দুপুর দুটোয় তমিজউদ্দিনের অপারেশন হলো। চর্বিযুক্ত ছোট্ট কেঁচোসদৃশ এক বিশেষ বস্তু পেট থেকে বের করে আত্মীয়-স্বজনদের দেখিয়ে বললেন, ‘অ্যাপেনডিসাইটিস হয়েছে, কেটে বের করে দিয়েছি দুষ্ট জিনিসটাকে। আর চিন্তা নেই’। টাকার বড়

প্যাকেটটা পকেটে পুরে লিফটে চড়ে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। আত্মিয়স্বজন বেশ খুশি। ঠিক সময়ে সঠিক কাজ হয়েছে। তমিজউদ্দিনের বিপদ কেটে গেছে। ডাক্তার সাহেব বলেছেন, দিন ছয়েক পর বাড়ি গিয়ে পরিবার-পরিজন নিয়ে ঈদ করতে পারবেন।

### তারপর?

ডাক্তার সাহেব দশ দিন ধরে শুধু ব্যথার ইনজেকশনই দিয়ে গেলেন। যতক্ষণ ওযুধের অ্যাকশন, ততক্ষণ ব্যথা কম। তারপর সেই একই যন্ত্রণা। ছয় দিনে তমিজউদ্দিনের আর ঘরে ফেরা হলো না। পনের দিনের মাথায় ডাকা হলো মেডিকেল বোর্ড। এবার শনাক্ত হলো, রোগীর ডান মূত্রনালিতে পাথর। সবকিছু কেমন যেন এলোমেলো হয়ে গেল। আত্মিয়-স্বজন সবার মাথায় বাজ পড়ল। এমন কাণ্ডটি ঘটবে তা তারা ভাবতেই পারেনি। খুব রাগ হলো ডাক্তার সাহেবের ওপর। সবারই মনে বেশ ক্ষেত্র, ডাক্তার সাহেব একি করলেন!

তমিজউদ্দিনকে আবার উড়োজাহাজে করে নিয়ে যাওয়া হলো অনেক দূরে, অন্য দেশে। লক্ষাধিক টাকা খরচ করে বিশ দিন পর তমিজউদ্দিন সুস্থ হয়ে ঘরে ফিরলেন। মুখে তার হাসি। তবে মনে বেশ রাগ। এবার বুঝতে পারলেন তমিজউদ্দিন কেমন ভালো চিকিৎসাটাই না পেয়েছেন! আসলে, তার অ্যাপেনডিসাইটিস হয়নি। তার ডান মূত্রনলে পাথর আটকে ছিল। পাথরের নড়াচড়ার ব্যথায় বেচারার পাগল হওয়ার দশা!

মৃত্র সঞ্চালন যন্ত্রের পাথর রোগ সচরাচর পরিলক্ষিত হয় এ রুকম একটা শারীরিক সমস্যা। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে বিভিন্ন বয়সের লোকদের এ সমস্যা দেখা যায়। তবে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে এ সমস্যা অনেকাংশে কম। ডান মূত্রনলের নিচের অংশে পাথর আটকালে ডান পেটে প্রচণ্ড ব্যথা হয়। সাথে বমি বা বমির ভাব হয়। পাথর ছোট হলে এর যন্ত্রণা বেশি। অনেকে ভুল করে এ ধরনের রোগকে অ্যাপেনডিসাইটিস ভেবে অপারেশন করে দেয়। যেমনটি ঘটেছে তমিজউদ্দিনের ভাগ্যে।

দুটো রোগের লক্ষণ একেবারেই আলাদা। চিকিৎসাব্যবস্থাও ভিন্নতর। মূত্রনলে পাথর আটকালে ব্যথা নিচে যৌনাস্ত্রের দিকে ধাবিত হয়, প্রস্তাবে জুলা-যন্ত্রণা অনুভূত হয়। অনেক ক্ষেত্রে প্রস্তাব লাল বর্ণের হয়। প্রস্তাব পরীক্ষা, এক্স-বে, আল্ট্রাসনেগ্রাফি ইত্যাদির সাহায্যে সহজেই পাথরের উপস্থিতি নির্ণয় করা সম্ভব। এতেও সন্দেহ থাকলে আই.ভি.ইউ. নামের বিশেষ এক্স-বের সাহায্যে পাথরের উপস্থিতি, অবস্থান, বৃক্ত বা কিডনির কার্যকারিতা ইত্যাদি সম্বক্ষে অনেক ধারণা পাওয়া যায়। ছোট ছোট পাথরগুলো বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এমনিতেই প্রস্তাবের সাথে বের হয়ে যায়। তবে রোগীকে বেশি বেশি পানি পান করতে হয়। নিয়মিত হাঁটা-চলা করতে হয় এবং প্রয়োজনে বেদনানাশক ওযুধ ও এন্টিবায়োটিক প্রয়োগ করতে হয়। বর্তমানে বিশেষ যন্ত্রের সাহায্যে পাথর বের করে আনা যায়, কিংবা ভাঙ্গা যায়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে আবার অপারেশনেরও প্রয়োজন হয়।

মৃত্র সঞ্চালনত্ত্বের পাথরের অনেক ধরনের চিকিৎসা বর্তমানে প্রচলিত আছে। সময়মতো এবং সঠিকভাবে চিকিৎসা করতে পারলে সুফল নিশ্চিত। কী কারণে মৃত্র সঞ্চালনত্ত্বে পাথর হয় এবং কী তার প্রতিরোধ ও প্রতিকার এ বিষয়ে ভবিষ্যতে বিশদ আলোচনা করব- আশা রাখছি।

মৃত্রনালির পাথরের ব্যথাকে অ্যাপেনডিসাইটিসের ব্যথা মনে করে তড়িঘড়ি অপারেশন করলে তমিজউদ্দিনের ভাগ্যই বরণ করতে হবে। ইতিপূর্বে অ্যাপেনডিসাইটিসের ব্যথা সম্বক্ষে লিখেছি। তা থেকে বোধকরি অ্যাপেনডিসাইটিস রোগ সম্বক্ষে মোটামুটি একটা ধারণা পাওয়া গেছে।

তমিজউদ্দিনের রোগ নির্ণয় ও এর চিকিৎসাব্যবস্থা শুধু হতাশার বাণীই বহন করে না বরং আমাদের ব্যর্থতার কথাও স্মরণ করিয়ে দেয়। নিজ ঘরের চিকিৎসকের প্রতি রোগীদের আস্তা কতটুকু তা খতিয়ে দেখার সময় এসেছে।

বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক একটু চিন্তা করে সিদ্ধান্ত নিলে এমন সমস্যার উন্নত হতো না। ইদানীং আমাদের কিছু কিছু চিকিৎসকের চিন্তার ক্ষেত্র যেন সংকুচিত হয়ে যাচ্ছে। কারণ তাঁদের চারপাশে উড়ছে কাড়ি কাড়ি টাকা। সময়ের বজ্জ অভাব তাদের। আর রোগ নিয়ে পড়াশোনার আগ্রহ আরো কম। অথচ সঠিকভাবে রোগ নির্ণয় করে যথাযথ চিকিৎসাব্যবস্থা নিশ্চিত করতে পারলে রোগীর আস্তার জায়গাটি সমৃদ্ধ হতো।

এখন দেশেই জটিল রোগের উন্নত চিকিৎসা সম্পন্ন হচ্ছে। এতে রোগীর খরচের অংক যেমন কমছে, তেমনি আত্মীয়-স্বজনের সাহচর্যে থাকার সুযোগটুকুও মিলছে। বিদেশে এটা কখনোই সন্তুষ্ট নয়।

চিকিৎসকের প্রয়োজন উপযুক্ত প্রশিক্ষণ নিয়ে যথাযথ চিকিৎসাদানের মাধ্যমে রোগীদের সারিয়ে তোলা। এতে যেমন সাধারণে আস্তার সংকট কমবে পাশাপাশি দেশীয় চিকিৎসকদের ওপর রোগীদের নির্ভরতাও বাড়বে। সাশ্রয় হবে দেশের অর্থ, উপকৃত হবে দেশের মানুষ।

## মা আজ বড় একা



চট্টগ্রামের লক্ষপতিত এক উকিল তিনি। অনেক জটিল মোকদ্দমায় জয়লাভ করে স্বনামধন্য হয়েছেন। প্রথম প্রথম আলাপে ফি নিতেন পাঁচশ টাকা। বছর পাঁচেক পর তা বেশ কয়েক গুণ বেড়ে যায়। অবশ্য প্রকাশ্যে তিনি তা স্বীকার করতেন না। ‘গরিবের মোকদ্দমা চালিয়ে পেট চালাই, এই তো বেশ’— উকিল বাবুর বিনীত বাক্যব্যয়। শহরের দক্ষিণ প্রান্তে ঘনবসতি এলাকায় তাঁর চারতলা পাকা দালান। স্ত্রী স্কুলশিক্ষিকা। বার বছর ধরে সকাল-সন্ধ্যা ঈশ্বরের ধ্যান করেন। অতঃপর পুত্রসন্তানের জননী হয়েছেন। ঘৃষ্ণীর দিন প্রায় হাজারখানেক অতিথিকে ভূরিভোজ করিয়ে ছেলের জন্য আশীর্বাদ কামনা করেছেন।

আমাকে প্রায়ই যেতে হতো উনার বাড়িতে। ঐ বাড়ির ছাদের এক কোণে আমার বড় বোনের ছোট দু কক্ষের আবাসন। কপাল ভাঙা বোন অনেক কষ্টে দিনাতিপাত করেন। সন্তানাত্তে দিদির ঘরে গিয়ে শুটকি ভর্তা দিয়ে পাত্তা না খেলে আমার ভালো লাগত না। তখন সরকারি মেডিকেল কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র আমি। আমাকে ঘিরে দিদির অনেক স্বপ্ন। উকিল বাবুর কাছে আমাকে নিয়ে বেশ গর্ব করেন। বোনের অন্তরের বাসনা আমি বুঝতে পারতাম।

শুভদিনে দাদার বিয়ে ঠিক হলো। বিয়েতে নিম্নৰূপ জানাতে উকিল বাবুর নিচ তলার অফিসে গেলাম। বেশ পরিপাটি অফিস। ব্রহ্মদেশের সেগুন কাঠের সুন্দর আসবাবপত্রগুলো বেশ দৃষ্টিনন্দন। নিম্নৰূপ পেয়ে খুব খুশি হলেন। মলিন বদনে

বললেন, ‘বেশ কয়েক দিন ধরে শরীর ভালো যাচ্ছে না। গতকাল রাতেও পেটে বেশ ব্যথা অনুভব করেছি। কবিরাজ হংসদাদুর সালসা খেয়েছি, দু-চারবার বেশ বড় বড় টেকুর উঠেছে। এখন একটু ভালো লাগছে। তবে তলপেটের বামদিকে এখনো থেমে থেমে ব্যথা করছে। পায়খানা হয়নি। নিম্নণ মাথায় রইল। দাদা-বৌদিকে আশীর্বাদ করছি। তবে তোমার দিদিমণি ছেলেকে নিয়ে বিয়েতে যাবে।’

এটুকু বলতে বলতেই উকিলবাবু বামদিকে তলপেটে হাত দিয়ে ঠোঁট কামড়িয়ে ধরলেন। ‘বাবা দেখতো, কবিরাজ বাবুর ওষুধে বুঝি কাজ হলো না।’

দেখতে দেখতে উনার মুখখানা ফ্যাকাসে হয়ে গেল।

বললাম,

—চলুন, আমাদের হাসপাতালে অভিজ্ঞ এক প্রফেসর আছেন। উনি আপনাকে সুস্থ করে তুলতে পারবেন।

—ঝাক বাবা, পরে তোমার দিদির সাথে কথা বলে জানাব। তোমার এখন কত কাজ। তোমাকে এ সময় কষ্ট দিই কী করবে।

সঙ্গাহখানেক পরে দাদার বিয়ে যথারীতি সম্পন্ন হলো। উকিল বাবুর স্ত্রী কিংবা ছেলে কাউকে বিয়েতে দেখিনি। মাস দুয়েক পর দাদার জামাই-ভাতের নিম্নণ নিয়ে গেলাম। উকিলবাবু সিঙ্কের পুরানো পাঞ্জাবি গায়ে অফিসে বসে আছেন। অনেক শুকিয়ে গেছেন। দেখতে বেশ রোগা মনে হলো। আমাকে দেখে কেঁদে ফেললেন।

‘বাবা, তোমাদের সাথে দেখা না করে বিদেশে ডাঙ্গার দেখাতে গিয়েছিলাম। অপারেশন হয়েছে। পেটে বড় টিউমার। ওরা অন্ত্রের অনেকটুকু কেটে টিউমারের সাথে বাদ দিয়েছে। দেখ, পেটের ডান দিকে পায়খানার টিউব বের করে দিয়েছে’। বলতে বলতে বেচারা কেঁদেই ফেললেন। তারপর সে অনেক কথা। এরই মাঝে আমাদের হাসপাতালে এসে কয়েক দফা ক্যামো নিয়েছেন। মাথার ঘন আধাপাকা চুল আর নেই। মুখখানা কেমন যেন ছোট হয়ে গেছে। বললেন, ‘দাদাভাই, আগামী মাসে আবার বাইরে যেতে হবে। ডাঙ্গার বাবু বলেছেন, অপারেশন করবেন। স্বাভাবিকভাবে পায়খানা হবে’।

তাই-ই হলো। বছর কয়েক বেশ ভালোই কেটেছে। তারপর একরাতে ইহধাম ত্যাগ করে চলে গেলেন উকিল বাবু।

উকিল বাবুর কী রোগ হয়েছিল, কেনইবা মারা গেলেন? এসব প্রশ্ন মনে আসা স্বাভাবিক। উনার পেটের বাম দিকে বৃহদত্তে ক্যান্সারের টিউমার হয়েছিল। যখন ধরা পড়েছে, তখন তা অনেক বড় হয়ে গেছে। প্রাথমিক অবস্থায় ধরা পড়লে হয়তো আরো অনেক বছর বাঁচতেন।

বৃহদত্তের ক্যান্সারের টিউমার সাধারণত চল্লিশোৰ্দ্ধ পুরুষ কিংবা মহিলাদের হয়ে থাকে। কী কারণে হয়, তা এখনো সঠিকভাবে জানা যায়নি। পৃথিবীর সব

দেশেই এ রোগ পরিলক্ষিত হচ্ছে। তবে যারা বেশি মাংস খান এবং কোষ্ঠকাঠিন্যে ভোগেন তাদের বৃহদত্ত্বের ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই অনেকটা সমানভাবে আক্রান্ত হন।

বিভিন্ন ধরনের লক্ষণ নিয়ে এ রোগ দেখা দিতে পারে। শতকরা পঁচিশ ভাগ ক্ষেত্রে অত্রের প্রতিবন্ধকতা বা অবস্ট্রাকশন হয় এ রোগে। এতে তলপেটে মাঝে মাঝে ব্যথা অনুভূত হয়, যা হঠাৎ প্রকট আকার ধারণ করে। পায়খানা হয় না এবং পেট ফেঁপে যায়। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে পায়খানার সাথে প্রায়ই রক্ত পড়ে। পেট ব্যথা, খাদ্য অরুচি ও কোষ্ঠকাঠিন্য ইত্যাদি উপসর্গ দেখা দেয়। চিপ্রিশ, পঁয়তাণ্ডিশোধ্বর কোনো ব্যক্তি যদি আগে নির্ণয়িত ভালোভাবে মলত্যাগ করতে পারতেন এবং হঠাৎ করে তার ব্যতিক্রম ঘটে, তবে এ ধরনের রোগ হয়েছে এমনটি সন্দেহ করা যথেষ্ট যুক্তিযুক্ত। এ ক্ষেত্রে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের দ্রুত পরামর্শ নেয়া প্রয়োজন। কোলনোক্সপি, বেরিয়াম অ্যানেমো এবং-রে ইত্যাদির সাহায্যে সহজেই এ রোগ নির্ণয় করা যায়। তবে এ রোগ কতটুকু ছড়িয়েছে তা নির্ণয়ের জন্যে আলট্রাসনোগ্রাফি, সিটি স্ক্যান ইত্যাদি পরীক্ষার দরকার হতে পারে। ছড়িয়ে পড়ার আগে তা নির্ণয় করতে পারলে এ ধরনের টিউমারের সফল অপসারণ সম্ভব। ফলাফলও অত্যন্ত চমকপ্রদ। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে সাময়িকভাবে পেটের অন্য কোন জায়গায় মলদ্বার তৈরি করে দিতে হয়, যা বিশেষ সময়ে বন্ধ করে দিয়ে প্রাকৃতিক নিয়মেই মলত্যাগের ব্যবস্থা করা হয়। রোগীরা সহজে এ পদ্ধতিকে মেলে নিতে চায় না এবং মানসিকভাবে ভেঙ্গে পড়ে। কোনো কোনো রোগীর ক্ষেত্রে এক ধরনের স্থায়ী মলদ্বার তৈরি করে দেয়া হয়। এ ক্ষেত্রে মল বিশেষ থলিতে জমা হয় এবং সময়ে সময়ে তা পরিষ্কার করে আবার বসিয়ে দিতে হয়। একে স্থায়ী কোলস্টমি বলে। স্থায়ী কোলস্টমির পরিচর্যার জন্যে রোগী ও সেবক-সেবিকার বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রয়োজন হয়। অস্থায়ী মলদ্বার দু-তিন মাস পর বন্ধ করে দেয়া হয় এবং রোগী স্বাভাবিক ভাবে মলত্যাগ করতে পারেন।

সাধারণত এ ধরনের রোগীকে অপারেশনের পর কেমোথেরাপি বা ক্ষেত্রবিশেষ রেডিওথেরাপি দেয়া হয়। তবে খুশির খবর, প্রাথমিক অবস্থায় এ রোগ নির্ণয় করে যথাযথ চিকিৎসা করতে পারলে ফলাফল বেশ ভালো। বর্তমানে বিশেষ পদ্ধতিতেও এ ধরনের রোগীর টিউমার অপারেশন করা হয়। এক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত কম সময়ে যেমন অপারেশন করা যায়, তেমনি রোগীও কম সময়ে স্বাভাবিক কাজকর্মে ফিরে যেতে পারেন।

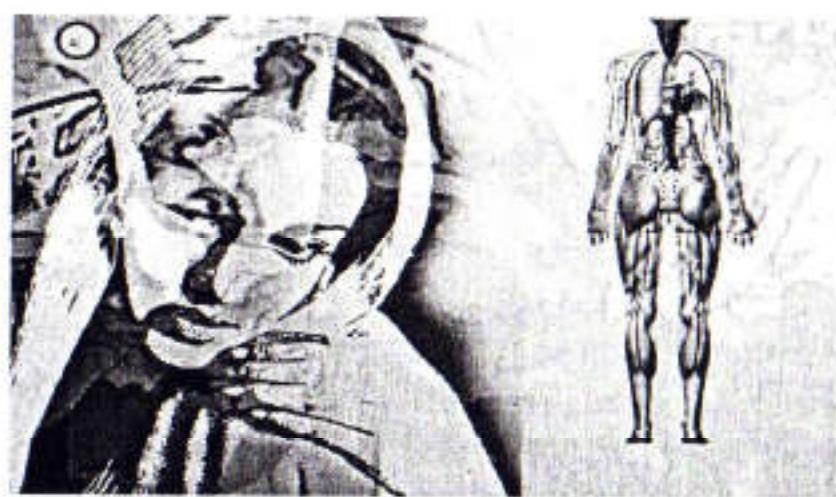
এ কথা সত্যি, আমাদের দেশে এ ধরনের রোগ অনেক দেরিতে নির্ণয় হয়। ফলে রোগ শরীরের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে। তাই চিকিৎসায় ভালো ফল আসে না। পৃথিবীর অনেক উন্নত দেশে আধুনিক ক্যান্সার গবেষণা-কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে, যেখানে এ ধরনের রোগের চিকিৎসাব্যবস্থা অপেক্ষাকৃত ভালো। আমাদের দেশের অনেক রোগী ঐ সব চিকিৎসাকেন্দ্রে প্রতিনিয়ত ধাবিত হচ্ছে। এতে

আমাদের জাতীয় মর্যাদা যেমন ক্ষুণ্ণ হচ্ছে তেমনি দেশের অর্থনীতিও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। আমাদের দেশেও বিশ্বমানের উন্নত ক্যান্সার হাসপাতাল ও গবেষণাকেন্দ্র গড়ে তোলা জরুরি।

পরিমিত ব্যায়াম, পর্যাপ্ত পানি পান, শাক-সবজি ও ফলমূল আহার নিয়মিত মলত্যাগে সহায়ক। যারা ভালোভাবে নিয়মিত মলত্যাগ করেন তাদের এ রোগ কম পরিলক্ষিত হয়।

কেটে গেল বেশ কয়েক বছর। উকিল বাবুর একমাত্র ছেলে পাড়ি জমিয়েছেন কানাডায়। ঘরে চুড়ো মা এখন একা। দৈনন্দিন ভেকে সময় পার করছেন। পরিচিত কারো সাথে দেখা হলে জড়িয়ে ধরে কাঁদেন।

## পরীর দ্বীপের নতুন বউ



আমের নাম পরীর দ্বীপ। দেশের দক্ষিণ সীমান্তে নদীর পাশ ঘেঁষে অবস্থিত উর্বর এক জনপদ। জনসংখ্যা হাজার বিশেক হবে। অধিকাংশই জেলে। এ গ্রামকে নিয়ে রয়েছে অনেক মজার মজার কাহিনী।

দু দশকেরও আগের কথা। মেডিকেল অফিসার হিসেবে নতুন চাকরি পেলাম পরীর দ্বীপের ছোট হাসপাতালে। টকটকে লাল মরিচের বোল খেয়ে কত রাত যে অনিদ্রায় কেটেছে তার কি হিসেব আছে!

এক রাতের কথা। বারোটা হবে। চার-পাঁচজন লোকের উচ্চকঢ়ের অনুরোধ শুনলাম।

‘ডাক্তার সাহেব বাড়ি আছেন? আমাদের নতুন বউর ভারি বিপদ হয়েছে। সন্ধ্যার পর পেটের ব্যথায় অজ্ঞান প্রায়। দয়া করে ওকে একটু দেখবেন?’

বারান্দায় বসে দারোয়ান আর কম্পাউন্ডার হারিকেন জুলিয়ে তাস খেলছিল। উচ্চথামে রেডিওতে গান চলছিল তখন। প্রায় প্রতিদিনই ওরা অনেক রাত অবধি তাস খেলে সময় কাটায়। তাতে আমারও সাহস লাগত। মাত্র ছমাস আগে আমার পোস্টিৎ হয়েছে। এখনো অনেক কিছুই আমার অপরিচিত। কম্পাউন্ডার প্রায়ই বলে, ‘স্যার, দু-চার মাসের বেশি এখানে কোনো ডাক্তার চাকরি করতে পারেননি’।

কারণ জিঞ্জেস করলে চুপ করে থাকে। কত কিছুই মনে আসে। কম্পাউন্ডারকে জিঞ্জেস করলাম,

- কত দূর পেসেন্টদের বাড়ি?
- স্যার, মাইল দুই হবে।

বড় দুটো হারিকেন নিয়ে ওরা আমার দরজার সামনেই দাঢ়িয়ে আছে। মুখে  
কোনো কথা নেই। বললাম,

- মেয়েলোকের পেট ব্যথা, পুরুষ ডাঙ্গার দিয়ে কী হবে?

- উপায় কি স্যার। এখানে মহিলা ডাঙ্গার নেই। সেলিনার মা আছে। ও  
আপনাকে সাহায্য করবে।

- সেলিনার মা! ও আবার কে?

- গেলেই না-হয় জানবেন।

মহান সৃষ্টিকর্তার ওপর ভরসা রেখে কম্পাউন্ডারকে নিয়ে সদ্য কেনা কালো  
রঙের ডাঙ্গারি ব্যাগ হাতে যাত্রা করলাম। ঘণ্টা দেড়েক ইঁটতে হয়েছে মেঘার বাড়ি  
পৌছতে।

‘স্যার, ভেতরে আসুন’। মেঘার সাহেবের সাদর অভ্যর্থনা।

মিনিট পাঁচ আলাপ শেষে সেলিনার মা এসে আমাকে বাড়ির ভেতর নিয়ে  
গেল। মেঘার সাহেবের বেশ বড় পাকা বাড়ি। সামনে বড় উঠান। রাতের আঁধারে  
বাড়ির আশেপাশের বড় বড় গাছ বেশ চোখে পড়ল।

সেলিনার মা ভারি বিনয়ী স্বভাবের মহিলা। বয়স পঞ্চাশের দিকে। এলাকার  
মহিলাদের বাচ্চা ডেলিভারি করান। সংসার বিষয়ে পরামর্শও দেন। বুঝলাম,  
এলাকায় বেশ সম্মানিতা মহিলা। একেবারে ভেতরের ঝুঁমে আমাকে নিয়ে যাওয়া  
হলো। সাথে আরো দু ভদ্রমহিলা। অন্ধকারে ওদের চেহারা খুব ভালো দেখতে  
পেলাম না। বড় একটা মশারির ভেতর চাদর জড়িয়ে রাখা হয়েছে নতুন বউকে।

‘স্যার আসুন’। সেলিনার মার সবিনয় অভ্যর্থনা।

মশারি উল্টিয়ে ভেতরে নিয়ে গেলেন আমাকে। নতুন বৌ জ্যোৎস্না বেগম।  
সকাল থেকে তলপেটে তার প্রচও ব্যথা। প্রায় সংজ্ঞাহীন। অনেক কষ্টে রোগীর  
হাতের শিরা খুঁজে পেলাম। দুর্বল দ্রুত-শিরা, সমৃহ বিপদের ইঙ্গিত দিয়ে যাচ্ছে।  
জিঙ্গেস করলাম,

-জ্যোৎস্নার মাসিক কবে হয়েছে?

-স্যার, আড়াই মাস হবে। তবে আজ বেশ রক্তস্নাব হচ্ছে।

রোগ বুঝতে পেরে বললাম-

-সদর হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। জরুরি অপারেশন দরকার।

শুনে মেঘার সাহেব বেশ চিন্তায় পড়ে গেলেন। আধ-ঘণ্টা যেতে না যেতেই  
পুরোনো একটি জিপ নিয়ে হাজির হলেন। অনেক কষ্টে রোগী সদর হাসপাতালে  
এনে জরুরি অপারেশন করানো হলো। জ্যোৎস্না সুস্থ হয়ে উঠল। মেঘার সাহেব  
খুশি হয়ে আমাকে দুবাই থেকে আনা দামি ঘড়ি উপহার দেন। আট মাসের বেশি  
আমাকে কাজ করতে হয়নি পরীর দ্বীপের হাসপাতালে। বিদেশ যাওয়ার ডাক  
এলো।

জ্যোৎস্নার রোগ বুঝতে পেরে আজও নিজেকে বেশ গর্বিত মনে করি। জ্যোৎস্নার চিকিৎসাব্যবস্থা সময়মতো নিতে না পারলে নিজেকে অপরাধী মনে হতো। জ্যোৎস্নার যে রোগ হয়েছিল তার নাম রাপচার্ড একটোপিক প্রেগনেন্সি অর্থাৎ অস্বাভাবিক স্থানে গর্ভধারণের জটিলতাবিষয়ক বিপদ। স্ত্রী-পুরুষের মিলনে স্ত্রী গর্ভধারণ করেন। ক্রমে স্ত্রীর জরায়ুর নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থান নেয় ও ক্রমে বড় হতে থাকে। এটাই স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। কোনো কারণে ক্রম জরায়ুর নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থান না নিয়ে অন্য কোথাও অবস্থান করে বড় হতে থাকলে তাকে আমরা একটোপিক প্রেগনেন্সি বা অস্বাভাবিক স্থানে গর্ভধারণ বলি। ধরা যাক, ক্রম ডিম্বকোষবাহী নালিতে অবস্থান নিয়ে বড় হতে থাকল। দু-চার মাস পরেই ঐ নালি স্ফীত হয়ে ফেটে যায়। ঐ সময় হঠাৎ তলপেটে প্রচও ব্যথা অনুভূত হয় ও প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়। রোগীর অবস্থা অতি দ্রুত ঘারাপ হতে থাকে। অনেক সময় রোগী জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। শিরা খুব দ্রুত চলতে থাকে ও রক্তচাপ কমে যায়। মাসিকের রাস্তা দিয়ে রক্তক্ষরণ হয়। চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে যায়। এমতাবস্থায় ডাক্তার ডেকে জরুরি চিকিৎসা শুরু করে রোগীকে বড় হাসপাতালে পাঠাতে হয়।

অনেক সময় ভুল করে একে আ্যপেন্টিসাইটিস, মৃত্যুলের পাথর, মৃত্যুলের প্রদাহ, তলপেটের টিউমার পঁয়াচিয়ে যাওয়া, তলপেটের ইনফেকশন ইত্যাদি রোগ ডেবে সেই অনুযায়ী চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়, যা অত্যন্ত বিপজ্জনক। রোগের সঠিক ইতিহাস জেনে বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে জরুরি ভিত্তিতে এ রোগ নির্ণয় করা সম্ভব। মনে রাখতে হবে এ রোগ অত্যন্ত বিপজ্জনক, তাই জরুরি ভিত্তিতেই এর চিকিৎসা করতে হবে। এ অবস্থায় অবশ্যই মহিলারোগ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ ও চিকিৎসাব্যবস্থা নেয়া বাধ্যনীয়। বর্তমানে বিশেষ হরমোন পরীক্ষা, আলট্রাসনেগ্রাফি ও ল্যাপারোস্কোপির মাধ্যমে এ রোগ ধরা যায়। মনে রাখা দরকার, কোনো যুবতী মহিলার মাসিক বন্ধ হলে, হঠাৎ পেটে প্রচও ব্যথা হয়ে মাসিকের রাস্তা দিয়ে রক্তস্নাব হলে, রোগী ফ্যাকাসে হলে এ রোগ সন্দেহ করে উপযুক্ত ত্বরিত ব্যবস্থা নিতে হবে। সময়মতো পদক্ষেপ নিতে না পারলে মৃত্যুও হতে পারে। বর্তমানে অনেক স্থানে বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মহিলারোগ বিশেষজ্ঞরা ল্যাপারোস্কোপির সাহায্যে পেট না কেটেই এ রোগের চিকিৎসা করছেন। চিকিৎসাবিজ্ঞানে নিশ্চয়ই এটা অত্যন্ত ফলপ্রসূ ও উন্নততর ব্যবস্থা। আমাদের দেশের কোনো কোনো হাসপাতালে এ ধরনের চিকিৎসাব্যবস্থা অনেক আগে থেকে প্রচলিত রয়েছে।

গ্রাথমিক অবস্থায় এ ধরনের অস্বাভাবিক জায়গায় গর্ভধারণ নির্ণয়ের পদ্ধতি বর্তমানে আবিক্ষৃত হয়েছে। আর গ্রাথমিক অবস্থায় তা নির্ণয় করতে পারলে ওমুধের মাধ্যমেও এ রোগের চিকিৎসা সম্ভব। সাধারণত যেসব মায়ের তলপেটে ইনফেকশন থাকে বা ডিম্বনালিতে অপারেশন হয়েছে তাদের ক্ষেত্রে এ রোগের বুঁকি বেশি।

সুতরাং যে সব মায়েরা তলপেটের বিভিন্ন ইনফেকশনে ভোগেন, তাদের উচিত মহিলারোগ বিশেষজ্ঞের পরামর্শমতো উপযুক্ত চিকিৎসা দেয়া।

অনেকের ধারণা, এ রোগে একবার আক্রান্ত হলে এরা পরবর্তীতে গর্ভধারণের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেন। এ কথা সব ক্ষেত্রে সত্য নয়। অপারেশনের পরও এদের ডিম্বকোষবাহী নালি এবং জরায়ু সজীব ও ভালো থাকে। সুতরাং পরবর্তীতে গর্ভধারণ করাই স্বাভাবিক। তবে এসব রোগীকে অবশ্যই মহিলারোগ বিশেষজ্ঞের গভীর পর্যবেক্ষণে থাকতে হবে এবং তাদের পরামর্শমতো চিকিৎসা নিতে হবে। যেসব মায়ের নিয়মিত মাসিক হতো, অথচ বর্তমানে মাসিক বন্ধ কিন্তু জরায়ু পরীক্ষা করে কোনো ক্রুণ তাতে পাওয়া যায়নি তাদের অস্বাভাবিক স্থানে গর্ভধারণ করেছে এমনটি সন্দেহ করতে হবে। বর্তমানে বিশেষ পদ্ধতির মাধ্যমে তা নির্ণয় করে যথাযথ চিকিৎসা দেয়া সম্ভব।

দীর্ঘদিন ধরে জ্যোৎস্না বেগম ও তার স্বামী মেম্বার সাহেবের সাথে আমাদের যোগাযোগ নেই। হয়তো জ্যোৎস্না বেগম ও মেম্বার সাহেব নাতি-নাতনি নিয়ে পরীর দ্বীপে সুখেই আছেন। নাতি-নাতনির পরীর দ্বীপের মজার কাহিনী শুনিয়ে ঘুম পাড়ান।

## যে আগুন সহজে নেতে না



চিকিৎসাবিজ্ঞানে উচ্চতর ডিগ্রি লাভ করে দেশের মানুষকে সেবা করার অঙ্গীকার নিয়ে দেশে ফিরেছেন তিনি। ছোটবেলার দারিদ্র্যের দুঃখময় স্মৃতি আজও তাঁকে পীড়া দেয়। অভাবের তাড়নায় বাবা-মা তাকে অনেক সময় সুচিকিৎসা করাতে পারেননি। নুন আনতে পানতা ফুরাত তাদের। কিন্তু প্রতিজ্ঞা ছিল, বড় হয়ে পরিবারের দারিদ্র্য দূর করবে, পাশাপাশি দেশের মানুষের সেবা করবে। বারবার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে ধরনা দিয়েছেন, বাড়ির কাছে বড় হাসপাতালে চাকরিতে পুনর্বহালের জন্যে। লাল ফিতার দৌরাত্ম্য, কিছু রাজনৈতিক নেতার পক্ষপাতিত্বের কারণে বারবার হতাশ মনে ফিরতে হয়েছে তাকে। পুরোনো বন্ধুদের পরামর্শ ও সহযোগিতা চেয়েছেন অকপটে। বন্ধুদের মধ্যে অনেকেই তখন স্ব-স্ব ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত।

এক রাতের কথা। দশটা বাজে তখন। বন্ধুদের নিয়ে এক ক্লিনিকে গল্প করছিলেন তিনি। পুরো কক্ষটাই সিগারেটের ধোয়ায় পরিপূর্ণ। হঠাৎ প্রচণ্ড হর্ণের শব্দ। অ্যাম্বুলেন্স চুকল রোগী নিয়ে। অ্যাম্বুলেন্সের লাল বাতিটা তখনও জুলছিল। তুঁড়িত গতিতে নেমে এলেন দুই ভদ্রলোক। স্ট্রেচার চায়। চারজন ক্ষীণ দেহের ওয়ার্ডবয় পুরোনো এক স্ট্রেচার নিয়ে এগিয়ে এল। তারি দেহের রোগীটাকে নিয়ে এল ডষ্টেরস ডিউটি রুমে। কর্তব্যরত ডাক্তার তখন পড়াশোনা নিয়ে ব্যস্ত। তবে রোগীর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে তেমন একটা দেরি করেননি। ডিউটি ডাক্তারদের বেশ চিত্তিত দেখাচ্ছিল। তবে কি রোগীর অবস্থা তেমন ভালো নয়!

ক্লিনিকের ডাইরেক্টর ডা. সাহেবের কলেজ জীবনের বন্ধু। কথা রাখতে হলো। দেখতে গেলেন ভদ্রলোককে। রোগীর কথাবার্তা জড়িয়ে যাচ্ছিল। রাত আটটার দিকে বন্ধুদের নিয়ে মেয়ের বিয়েতে খুব করে খেয়েছেন। অতঃপর অল্প একটু শরাবও। এরপর থেকে পেটের উপরিভাগে শুরু হলো প্রচণ্ড ব্যথা। গলগল করে বমি। শ্বাসকষ্ট। দুর্বল শিরা খুব দ্রুত চলছে। রক্ত চাপ বেশ কমে আসছে। পেটের অসহ্য যন্ত্রণা আর অস্থিতে ছটফট করছেন। বুঝতে দেরি হলো না, পেটে মারাত্মক কিছু একটা হয়েছে। সাথে সাথে শিরায় স্যালাইন দেয়া হলো। নাকে লাগানো হলো অঙ্গীজেন। মাংসপেশিতে ব্যথানাশক ইনজেকশন পুশ করা হলো। প্রস্তাবের রাস্তায় পাইপ লাগানো হলো। রাত গভীর হলো। শহরের সবকটি প্যাথলজি বন্ধ। ক্লিনিকের অতি পুরোনো ইসিজি মেশিনটা কাজে লাগানো হলো।

বিদেশ থেকে ফেরার পর এটাই ডাক্তার সাহেবের প্রথম রোগী। সফল হওয়া চাই-ই। রোগীকে বেশ কয়েকবার দেখলেন। নতুন কিছু ওষুধও সংযোজন করলেন। ততক্ষণে রোগী কিছুটা আরাম অনুভব করছে। তবে নাক ও প্রস্তাবের রাস্তার পাইপ দুটো তাঁর সহ্য হচ্ছিল না।

ততক্ষণে রোগীর সাথে ভাব হয়ে গেল। পরিচয় জানা গেল। রতনপুর গ্রামের নামকরা জনপ্রতিনিধি। দু দুবার অনায়াসে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছেন। তাই লোকজনের আসা-যাওয়ার কমতি ছিল না। পরামর্শ আর পরিকল্পনারও শেষ নেই। কেউ বললেন, মেডিকেল বোর্ড বসাতে, আবার কেউবা বললেন দেশের বাইরে নিয়ে যেতে। ততক্ষণে পরীক্ষা-নিরীক্ষার রিপোর্টগুলোও হাতে এসে পৌছল। বড়লোকের বড়-ব্যাধি। সঞ্চাহখানেক খাওয়া-দাওয়া বন্ধ। স্যালাইন আর ওষুধের ওপর রাখা হলো। চেয়ারম্যান সাহেবের লোকরা ডাক্তার সাহেবের সাথে অনেক কিছু নিয়ে আলাপ করলেন। তারপর অনেক কথা। কেউ বললেন ডাক্তার সাহেব বেশ দরদি। কেউবা বললেন নতুন ডাক্তার, বছর পাঁচ-সাতেক যাক, তার পর তো নির্ভর করা যাবে ইত্যাদি ইত্যাদি।

আটচল্লিশ ঘণ্টায় ছয়জন বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ নেয়া হলো। দুবার মেডিকেল বোর্ড করে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকবৃন্দ তাঁদের সুচিত্তিত মতামত ও চিকিৎসাব্যবস্থা দিয়েছেন। দিন দশেক পর চেয়ারম্যান সাহেব অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠলেন। হালকা খাওয়া-দাওয়াও শুরু করলেন। নাক আর প্রস্তাবের রাস্তার টিউব খুলে দেয়া হয়েছে। পনের দিনের মাথায় হাজার ত্রিশেক টাকা পেমেন্ট করে তিনি হাসপাতাল ত্যাগ করলেন।

চেয়ারম্যান সাহেবের যে রোগ হয়েছিল তার নাম অগ্ন্যাশয়ের হঠাত প্রদাহ। অগ্ন্যাশয় কী? কোথায় এর অবস্থান, কী এর কাজ, আর কেনইবা এর প্রদাহ? প্রদাহ হলো কীভাবে বুঝতে হবে, কী ব্যবস্থা নিতে হবে ইত্যাদি জানার প্রয়োজন রয়েছে।

অগ্ন্যাশয় আমাদের দেহের একটা বড় গ্রন্থি। দেখতে অনেকটা লম্বা পাতার মতো। পেটের মাঝখানে নাভি বরাবর এর অবস্থান। এ গ্রন্থি থেকে পরিপাক রস

যেমন: অ্যামাইলেস, লাইপেস, ট্রিপসিন ইত্যাদি নিঃসৃত হয় যা আমিষ, শর্করা, চর্বি জাতীয় খাদ্য পরিপাক করে। এছাড়া এ থেকে নিঃসৃত হয় ইনসুলিন, প্লাকাগন নামক হরমোন। এসব হরমোন দেহে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে। সুতরাং বোধা যাচ্ছে, এসব পরিপাক রসের নিঃসরণ করে গেলে খাদ্যদ্রব্য পরিপাকে ব্যাঘাত ঘটে। আবার ইনসুলিন নিঃসরণ করে গেলে বহুমূল্ক বা ডায়াবেটিস রোগের সৃষ্টি হয়।

বিভিন্ন কারণে ও বিভিন্নভাবে অগ্ন্যাশয় আক্রান্ত হতে পারে। হঠাতে প্রদাহ, দীর্ঘদিনের প্রদাহ, ক্যাঙ্গারজাতীয় টিউমার ইত্যাদি জটিল ব্যাধি সচরাচর পরিলক্ষিত হয়। অগ্ন্যাশয়ের হঠাতে প্রদাহের বিভিন্ন কারণও রয়েছে। পিণ্ডথলের পাথর ও অত্যধিক অ্যালকোহল (মদ) সেবন এর অন্যতম কারণ। এছাড়া ভাইরাসের আক্রমণ ও আঘাতজনিত কারণ কিংবা শরীরের রোগ প্রতিরোধবিষয়ক সমস্যা উল্লেখযোগ্য। আমাদের দেশে অগ্ন্যাশয়ের হঠাতে প্রদাহের অন্যতম কারণ পিণ্ডথলের পাথর। যারা অধিক মাত্রায় চর্বিজাতীয় খাদ্য গ্রহণ করেন, পিণ্ডথলের পাথর হওয়ার সম্ভাবনা তাদের বেশি। সঙ্গত কারণেই এদের অগ্ন্যাশয়ের প্রদাহ বেশি পরিলক্ষিত হয়।

ইদানীং আমাদের দেশে প্রতিটি বিবাহ উৎসবে পাঁচ থেকে ছয় দফায় দাওয়াতের রেওয়াজ প্রচলিত রয়েছে। প্রতিবারেই অনেক টাকা খরচ করে রসনা তৃষ্ণি বা মহাভোজ উৎসবের আয়োজন করা হয়। এতে অনেক ক্ষেত্রে মেয়ে-পক্ষের বারোটা বেজে যায়। অনেকের অভিমত, এ ধরনের অতি চর্বিযুক্ত খাদ্য গ্রহণ করার কারণে উচ্চরক্তচাপ, বহুমূল্ক, হার্ট ও মস্তিষ্কের অ্যাটিক ইত্যাদি মারাত্মক ব্যাধি উল্লেখযোগ্য হারে বাঢ়ছে। এ ধরনের অতি-ভক্ষণের কুফলের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় সামাজিক পদক্ষেপ নেয়া জরুরি বলে বিশেষজ্ঞদের অভিমত।

অনেক আগ থেকে পশ্চিমা দেশগুলোতে অ্যালকোহল সেবনের রেওয়াজ প্রচলিত। লক্ষণীয়, ইদানীং তা বাংলাদেশকেও ভালোভাবে পেয়ে বসেছে। এর প্রভাব পড়েছে সমাজ তথা রাষ্ট্রে। পেয়ে বসেছে সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ প্রজন্মাকে। সহসা এর প্রতিকার এবং প্রতিরোধের ব্যবস্থা নিতে না পারলে আমাদের দেশেরও বারোটা বাজবে।

পশ্চিমা দেশগুলোতে অগ্ন্যাশয়ের হঠাতে প্রদাহের অন্যতম কারণ অতি মাত্রায় মদপান। অতিমাত্রায় মদপানের বিরুদ্ধে তারা ব্যবস্থা নিতে শুরু করেছেন। ধূমপানের কুফল বুঝতে পেরে ইতিমধ্যে ধূমপানবিরোধী অনেক কার্যকর ব্যবস্থা নিয়েছেন। আর আমরা?

কারণ যাই হোক, অগ্ন্যাশয়ের প্রদাহ একটা মারাত্মক রোগ। গুরুতরভাবে আক্রান্তদের ক্ষেত্রে মৃত্যু ঝুঁকি শতকরা প্রায় পঁচিশ ভাগ। অতি-চর্বিযুক্ত খাদ্য গ্রহণ কিংবা মদপানের পর হঠাতে পেটের উপরিভাগে প্রচও ব্যথা অনুভূত হলে অগ্ন্যাশয়ের প্রদাহ হয়েছে এমনটি সন্দেহ করতে হবে। ব্যথা ক্রমশ পেছনে শিরদীড়ার দিকে ছড়িয়ে পড়ে। সাথে প্রচুর বমি হয়, পেট ফেঁপে যায়, গায়ে জুর আসে। রক্তে

অ্যামাইলেস নামক এনজাইমের পরিমাণ হাজারের উপরে বাড়তে থাকে। আলট্রাসনেগ্রাফি বা সিটি স্ক্যান করলে বেশির ভাগ রোগীর ক্ষেত্রে অগ্ন্যাশয়ের প্রদাহ হয়েছে তা বোঝা যায়। এ ধরনের সমস্যা হলে অবশ্যই কালঙ্কেপণ না করে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। অগ্ন্যাশয়ের প্রদাহ হলে চিকিৎসক খাদ্য গ্রহণ বন্ধ করে দেন ও শিরার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় পানি, লবণ, খাদ্য ইত্যাদি প্রয়োগ করেন। ব্যথানাশক ও মুখ হিসেবে পেথিডিন, মরফিন ইত্যাদি ইনজেকশন দেন। ইনফেকশন যাতে ছড়িয়ে পড়তে না পারে সে জন্যে শিরার মাধ্যমে অ্যান্টিবায়েটিক প্রয়োগ করেন। এতে অধিকাংশ রোগী সন্তানের মধ্যে আরোগ্য লাভ করে। অগ্ন্যাশয়ের প্রদাহ গুরুতর হলে বোগীর অবস্থা খারাপের দিকে চলে যায়, এসমকি তাকে পচন ধরে। এ ধরনের সমস্যা হলে অনেক ঝুঁকি নিয়ে অপারেশনের মাধ্যমে রোগীর জীবন বাঁচানোর চেষ্টা চালাতে হয়। অগ্ন্যাশয়ের প্রদাহের কারণ খুঁজে বের করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তা দূর করার ব্যবস্থা নিতে হয়।

কোনো কোনো ক্ষেত্রে অগ্ন্যাশয়ের প্রদাহ স্থিমিত হওয়ার পর পেটের উপরিভাগে বড় টিউমারসদৃশ চাক তৈরি হয়। পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে তা নির্ণয় করা সম্ভব। একে আমরা অগ্ন্যাশয়ের নকল সিস্ট বলি। এ সিস্টে অগ্ন্যাশয় থেকে নিঃসৃত পরিপাক-রস সমৃদ্ধ তরল পদার্থ সঞ্চিত থাকে। কোনো কোনো সিস্ট এমনিতেই সেরে যায়। তবে কোনো কোনোটির অপারেশনের প্রয়োজন পড়ে। বিশেষ কিছু ক্ষেত্রে অগ্ন্যাশয়ের হঠাত প্রদাহ নিরূপণে সমস্যা হয়। ভুলক্রমে তা অ্যাপেনডিসাইটিস, অন্ত ফুটো হয়ে যাওয়া ইত্যাদি রোগ ভেবে জরুরি অপারেশন করা হয়। যা কোনোভাবেই কাম্য নয়। অগ্ন্যাশয় পচে ইনফেকশন পেটে ছড়িয়ে পড়লে অনেক ক্ষেত্রে রোগীর মৃত্যুও হতে পারে।

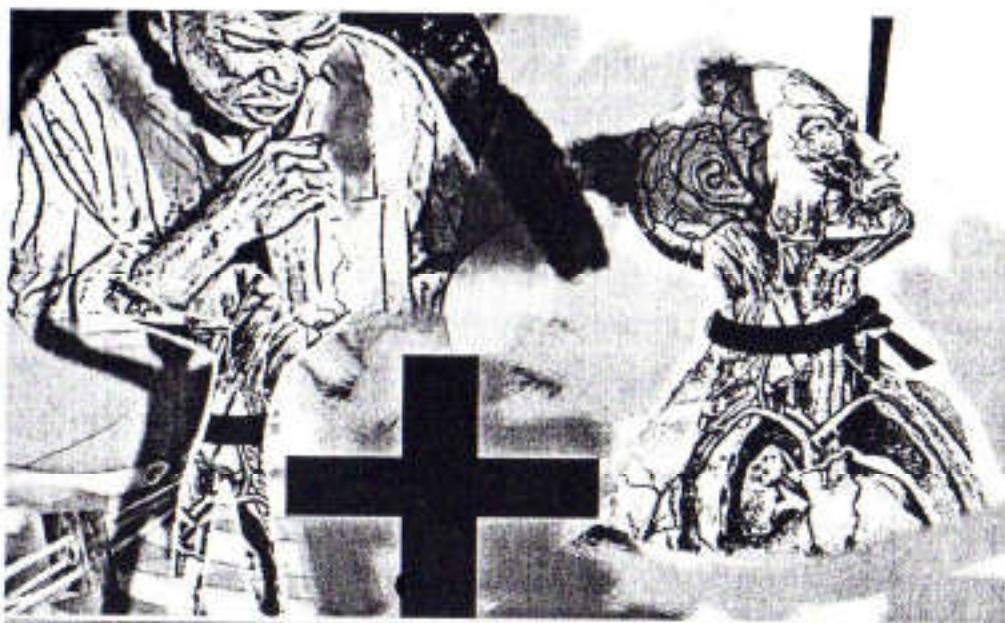
অধিক মাত্রায় মদ্যপায়ীদের অগ্ন্যাশয়ের প্রদাহ দুরারোগ্য ব্যাধিতে পরিণত হয়। তুষের আগুনের মতো এ আগুন যেন জ্বলতেই থাকে, সহজে নেতে না।

রোগ পুরোনো হলে অগ্ন্যাশয় নষ্ট হয়ে যায়। ফলে অগ্ন্যাশয় থেকে নিঃসৃত জ্বরক রাসের ঘাটতি দেখা দেয় এবং খাদ্য পরিপাকে ব্যাঘাত ঘটে। পায়খানা সাবানের ফেনার মতো হয়। শরীর শুকিয়ে যায়। খাদ্য গ্রহণে পেটে ব্যথা হয় ইত্যাদি। ইনসুলিনের অভাবে বহুমুক্ত রোগের সৃষ্টি হয়। এ ধরনের জটিল রোগের চিকিৎসা ব্যয়বহুল ও অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। অভিজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শে সবকিছু করা উচিত। সুতরাং বুঝাতে হবে, খাদ্য গ্রহণের পর পেটের উপরিভাগে তৌব্র ব্যথা অনুভূত হলে ও তা পেছনে মেরুদণ্ডের দিকে ছড়িয়ে পড়লে অগ্ন্যাশয়ের হঠাত প্রদাহ শুরু হয়েছে এমনটি সন্দেহ করতে হবে। তবে হঠাত পেটে ব্যথার অন্যান্য কারণ যেমন : পিস্তথলের ইনফেকশন ও পাথরের ব্যথা, পেপটিক আলসারের ব্যথা, অন্ত ফুটো হয়ে যাওয়া, অ্যাপেনডিসাইটিসের ব্যথা ইত্যাদির সম্ভাবনা বিবেচনায় আনতে হবে। অগ্ন্যাশয়ের প্রদাহের কারণ খুঁজে বের করে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে হবে। আমাদের দেশে অগ্ন্যাশয়ের প্রদাহের অন্যতম প্রধান কারণ পিস্তথলের পাথর।

পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ধরা পড়লে তা সময়মতো অপসারণের ব্যবস্থা নিতে হবে। এছাড়া মদ ও ধূমপান এবং অতিরিক্ত চর্বিযুক্ত খাবার গ্রহণ থেকে বিরত থাকতে হবে।

রত্নপুরের চেয়ারম্যান সাহেব ডাক্তারের পরামর্শ মেনে চলছেন। ধূমপান করেন না। মদ-পান ছেড়ে দিয়েছেন। ডাক্তার নির্দেশিত খাদ্য তালিকা মেনে চলছেন। বেশ কয়েকবার বিদেশে গিয়ে চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়েছেন। শরীরের ওজন অনেক কমেছে। তিনি এখন আগের চেয়ে অনেক সুস্থ। সম্প্রতি নিজ এলাকার জনসাধারণ নিয়ে মদ ও ধূমপানবিরোধী বিশাল র্যালির নেতৃত্বে দিয়েছেন। প্রতিটি জনসভায় তিনি উপস্থিত জনতাকে নেশাকে 'না' বলার অনুরোধ জানান।

## গলায় ফাঁস



ডাঙ্গার মোহাম্মদ হামিদ। পার্বত্য জেলা রাঙামাটির পাহাড়ি জনবসতির জনপ্রিয় এক চিকিৎসক। বরিশাল জেলার নদীগ্রামে তার আদি বাড়ি। খুব বুদ্ধিমান এবং স্থিতিধি প্রকৃতির লোক। বরিশালের আঞ্চলিক ভাষায় বেশ গুছিয়ে কথা বলেন। চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষায়ও ভালো দখল তার। পাহাড়ি ভাষা কিছু কিছু বোঝেন, তবে ভালো বলতে পারেন না।

বছর পাঁচেক আগের কথা। দুপুর দুটো হবে। পেটব্যথায় কাতর এক যুবককে নিয়ে ডা. হামিদ হাজির হলো ডাঙ্গার সেলিম সাহেবের চেম্বারে। বয়স বাইশ তেইশ হবে। নাম করিমুল্লাহ। ছোটখাটো এক মুদির দোকানের মালিক।

রোগী আনা-নেয়ার সুবাদে হামিদ সাহেবের সাথে ডা. সেলিমের দীর্ঘদিনের পরিচয়। অন্তত দশ বছর ধরে স্থানীয় জনসাধারণকে চিকিৎসাসেবা দিয়ে বেশ ভালোই চলছে হামিদ সাহেবের। স্থানীয় লোকেরা তাকে বিপদের বক্তু মনে করে। প্রয়োজনে শহরে এসে রোগীর বিভিন্ন কাজকর্মে ব্যয় করেন দিনের পুরো সময়টুকু। রোগীর সাথে প্রতারণা করেছেন এমন অভিযোগ কারও কাছে শোনা যায়নি। তবে ওপর রোগীদের খুব বিশ্বাস।

চিকিৎসাবিজ্ঞানে হামিদ সাহেবের কোনো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নেই বটে, তবে রোগ সমস্কে তার যে ভালো ধারণা রয়েছে-এ ব্যাপারে সন্দেহের অবকাশ নেই। কথায় কথায় ডা. সেলিম জিজ্ঞেস করলেন-

- হামিদ সাহেব, পাহাড়িদের জুর হলে কোন রোগটা বেশি বিবেচনা করেন?

- স্যার রোগের কারণ তো একটাই- ম্যালেরিয়া। কুইনাইনজাতীয় ওষুধ প্রেসক্রিপশন করি। তাতে ভালো ফল হয়। জ্বর সেরে যায়। ওখানে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার সুযোগ কই?

- বেশ বলেছেন। বলুন তো, এ রোগীর পেট ব্যথার কারণ কী।

- স্যার, কয়েক বছর ধরে সে হার্নিয়া রোগে ভুগছে। ভয়ে ভয়ে অপারেশন করতে চায়নি। ব্যথাটা হার্নিয়ার কোনো জটিলতার কারণে হবে হয়তো!

হামিদ সাহেবের জবাব শুনে ডাক্তার সাহেব বেশ খুশি হলেন। ততক্ষণে রোগী বেচারা বিরক্ত হয়ে উঠল। পেট মোচড় দিয়ে ব্যথা হচ্ছে, সাথে বমি। রোগের বিবরণ নিয়ে জানা গেল, বছর পাঁচেক ধরে তার ডানদিকে তলপেটে অঙ্কোষের উপরে ফোলা ফোলা ভাব। দাঁড়ালে কিংবা কাশি দিলে তা বড় হয়ে যেতো, আবার শুয়ে পড়লে পরে তা মিশে যেত। কখনোবা মৃদু ব্যথা অনুভব করত। খুব একটা কষ্ট পায়নি বলে আমলে নেয়নি। লজ্জায় বঙ্গ-বাঙ্কর এমনকি পরিবারের কাউকে বলেনি। কিন্তু আজ সকালে হঠাতে করে তা বেশ ফুলে শক্ত হয়ে গেছে। খুব ব্যথা শুরু হলো ওখানে। শুয়ে ছিল অনেকক্ষণ, কমে না। ছোট করার জন্যে বেশ চাপাচাপি করেছে। সফল হয়নি। উপায়ান্তর না দেখে ডাক্তারের শরণাপন্ন হলো। হামিদ সাহেব রোগ বুঝতে পেরেছেন। সমস্যা বেশ জটিল। ওকে নিয়ে এলেন শহরে।

ডাক্তার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বুঝতে পারলেন হার্নিয়ায় ফাঁস লেগেছে। জরুরি অপারেশন প্রয়োজন। হাসপাতালে ভর্তি করিয়ে দিলেন। শিরার মাধ্যমে স্যালাইন আর আ্যান্টিবায়োটিক প্রয়োগ করলেন। রোগী ও অভিভাবকের অনুমতিক্রমে অপারেশনের ব্যাবস্থা ও হলো। শুন্দ্রাত্মের প্রায় আট-দশ ইঞ্চি পচে গেছে। পচা অংশ কেটে ভালো দু মাথা জোড়া লাগিয়ে দিলেন। তিন-চার দিন তার বেশ ভালোই কাটলো। পরে কাটা জায়গায় পুঁজ হওয়াতে দিনে দুবার ড্রেসিং করতে হয়েছে। প্রায় পক্ষকাল অনেক কষ্ট পেয়ে রোগী আরোগ্য লাভ করলেন। টাকাও খরচ হলো বেশ। তবে সুস্থ হয়ে স্বাভাবিক কাজে ফিরে যেতে পেরে রোগী বেশ খুশি। সবার বেশ ভালো লাগল। কষ্ট সার্থক হলো। সেই সাথে হামিদ সাহেবেরও মুখ উজ্জ্বল হলো।

করিমুল্লাহর যে রোগ হয়েছিল তার নাম এসট্রেনগুলেটে হার্নিয়া অর্থাৎ হার্নিয়ার গলায় ফাঁস। হার্নিয়া সমস্কে অনেকেরই বেশ ভালো ধারণা রয়েছে। সাধারণ মানুষ কেউ একে একশিরা বলে। আবার কোনো কোনো অঞ্জলের লোক একে বাকশিরা ইত্যাদি নামে আখ্যায়িত করে থাকে। পরিত্রাণের মহীষধ হিসেবে কুমিরের দাঁত, সামুদ্রিক বড় মাছের মেরুদণ্ডের হাড়, ঝুপার চাঁদ, তাবিজ ইত্যাদি কোমরে সুতা দিয়ে ঝুলিয়ে দেয়। কেউ কেউ হোমিওপ্যাথিক বা কবিরাজি ওষুধও সেবন করেন। তাতে কতটুকু লাভবান হয়েছেন তা তারাই ভালো জানবেন। তবে বিভিন্ন কারণে যাদের অপারেশন করা যায় না তাদের বিশেষ ধরনের হার্নিয়া বেল্ট ব্যবহার করতে ডাক্তাররা পরামর্শ দেন।

হার্নিয়া বলতে কী বোবায়, হার্নিয়ার কারণ কী। হার্নিয়ার জটিলতা ও চিকিৎসা পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয়ে কিছু আলোচনা করলে রোগটা সম্বক্ষে ভালো ধারণা পাওয়া যাবে।

আমাদের শরীরের বিভিন্ন অংশে রয়েছে গহ্বর বা কেভিটি। ঐ সব গহ্বরে রয়েছে বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। পেটের গহ্বরের কথাই বলি। পেটের গহ্বর উপরে, নিচে, সামনে, পেছনে, দেয়াল দ্বারা বেষ্টিত। এই সব দেয়াল চামড়া, চর্বি, মাংসপেশি এবং অন্যান্য তত্ত্ব দ্বারা গঠিত। এসব তত্ত্ব দ্বারা গঠিত শক্তিশালী আবরণ একদিকে যেমন পেটের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে বাইরের আঘাত থেকে রক্ষা করে তেমনি স্বস্ত্রান থেকে বিচ্যুত হওয়াও রোধ করে। কেবলো কারণে গহ্বরের দেয়াল দুর্বল হয়ে পড়লে, ঐ দুর্বল স্থান দিয়ে গহ্বরের বিভিন্ন অঙ্গ কিংবা তার অংশ, যেমন অন্ত, চর্বি ইত্যাদি বের হয়ে চামড়ার নিচে চলে আসে ও ফোলা ফোলা ভাব সৃষ্টি করে। একে ডাক্তারি ভাষায় বলা হয় হার্নিয়া।

শরীরের বিভিন্ন স্থানে হার্নিয়া পরিলক্ষিত হয়। অবস্থান বিবেচনায় এদের নামকরণও ভিন্ন ভিন্ন। পেটের একেবারে নিম্নভাগে ও অওকোষের দিকে যেসব হার্নিয়া পরিলক্ষিত হয়, তাদের বলা হয় ইনগুইনাল হার্নিয়া। আমাদের দেশে এ ধরনের হার্নিয়াই সবচেয়ে বেশি পরিলক্ষিত হয়। নাভির ভেতর দিয়ে হার্নিয়া বের হলে একে আমরা নাভির হার্নিয়া বা আমবেলাইকেল হার্নিয়া বলি। অনুরূপভাবে ফিমোরাল হার্নিয়া, ইপিগেস্ট্রিক হার্নিয়া ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের হার্নিয়া আছে। শিশুকাল থেকে হার্নিয়া দেখা গেলে তাকে আমরা জন্মগত হার্নিয়া বা কনজেনিটাল হার্নিয়া বলি।

কোষ্ঠকাঠিন্য, দীর্ঘদিনের কাশি, প্রস্তাব ত্যাগে বেশি চাপ প্রয়োগ, ভারী জিনিস উত্তোলন, শরীরে অতিরিক্ত চর্বি ইত্যাদি হার্নিয়া রোগ সৃষ্টির জন্য দায়ী বলে মনে করা হয়। অপারেশনের স্থান দুর্বল হলে ঐ স্থানে হার্নিয়া দেখা দিতে পারে। একে আমরা অপারেশনজনিত হার্নিয়া বা ইনসিশানাল হার্নিয়া বলি।

ছোট-বড় সব বয়সেই হার্নিয়া হতে পারে। তবে যৌবন ও বৃদ্ধ বয়সে হার্নিয়া বেশি পরিলক্ষিত হয়। পুরুষ ও মহিলা উভয়েই এই সমস্যায় আক্রান্ত হতে পারেন। তবে পুরুষের সংখ্যাই বেশি।

হার্নিয়া যে স্থানেই হোক না কেন, প্রথমে ঐ জায়গায় মৃদু ব্যথা ও ভারি ভারি ভাবে অনুভূত হয়। ক্রমে ঐ জায়গায় ফেলা ফোলা ভাব দেখা দেয়। পরবর্তীতে তা বড় হতে থাকে। শুয়ে বিশ্রাম নিলে তা অনেকটা বিলীন হয়ে যায়। বাঢ়া কাঁদলে বা দাঁড়ালে সাধারণত ওদের হার্নিয়া ভালোভাবে পরিলক্ষিত হয়।

অতএব বলা বাহ্য্য, এ ধরনের ফোলা ভাব দেখা দিলে হার্নিয়া হয়েছে বলে ধারণা করতে হবে এবং সময়মতো ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে। এর বিভিন্ন জটিলতা অনেক সময় জীবনের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। হার্নিয়ার ফাঁস, হার্নিয়ার ইনফেকশন এ ধরনের মারাত্মক সমস্যা। তাই এ ধরনের জটিলতা সৃষ্টির আগেই যথাযথ চিকিৎসা নেয়া প্রয়োজন।

প্রশ্ন করতে পারেন, সব হার্নিয়া রোগীর অপারেশন দরকার কিনা? অতি বুড়ো বয়সে জটিলতাহীন ছোট হার্নিয়া কিংবা মারাত্মক হৃদরোগীর হার্নিয়া অপারেশন না করাই শ্রেয়। এক্ষেত্রে হার্নিয়া বেল্ট ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে এসব রোগী ডাক্তারের নিয়মিত পর্যবেক্ষণে থাকতে হবে। এ-ধরনের দু-একটি কারণ ছাড়া বাকি সব রোগীকে অপারেশনের পরামর্শ দেয়া যেতে পারে। বাচ্চাদের ক্ষেত্রে যথনই হার্নিয়া ধরা পড়ে, নিকটবর্তী সময়েই অপারেশন করিয়ে নেয়া শ্রেয়। নতুন যে কোন সময় হার্নিয়া আটকে যেতে পারে। আর এ অবস্থায় জরুরি অপারেশন অত্যাবশ্যক। তবে তা অধিক ঝুঁকিপূর্ণ।

অনেকের ধারণা, অঙ্কোষের কাছাকাছি হার্নিয়া অপারেশন করলে ভবিষ্যতে সন্তান না হওয়ার ঝুঁকি থাকে। আসলে তা সত্য নয়। এমনকি দুদিকে অপারেশন করা হলেও এই ধরনের ঝুঁকির সন্তান নেই। তবে এ ধরনের হার্নিয়া অভিজ্ঞ সার্জন দ্বারা অপারেশন করাই শ্রেয়। সাধারণত অপারেশন-পরবর্তী জটিলতা অত্যন্ত নগণ্য। কোনো কোনো রোগীর কাটা জায়গায় ইনফেকশন হতে পারে যা যথাযথ চিকিৎসায় সহসা সেরে যায়। তবে সঠিকভাবে অপারেশন করা না হলে বা যেসব কারণ হার্নিয়ার জন্য দায়ী তার সুচিকিৎসা না হলে পুনরায় হার্নিয়া দেখা দিতে পারে। এতে অনেক সময় রোগী হতাশ হয়ে পড়ে। পরবর্তীতে ভালোভাবে অপারেশন করলে সফলতা শতভাগ।

বর্তমানে বিভিন্ন আধুনিক পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে। বিশেষ ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ হার্নিয়া অপারেশনে নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছে। কোনো কোনো হাসপাতালে বিশেষ যন্ত্র, যেমন: ল্যাপারোস্কোপের সাহায্যেও বিশেষ কিছু হার্নিয়া অপারেশন করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে খরচ একটু বেশি ও বিশেষ প্রশিক্ষণের প্রয়োজন হয়। তবে বিশেষ ক্ষেত্রে তা অত্যন্ত কার্যকর।

আমাদের দেশে সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালসমূহে প্রতিনিয়ত এ রোগের হাজারো অপারেশন হচ্ছে। অর্থনৈতিকভাবে যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বছরে অন্তত শত কোটি টাকা হার্নিয়া অপারেশনে খরচ হচ্ছে। তাই এই অপারেশনে বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রয়োজন।

অনেক রোগী এ ধরনের অপারেশনের জন্যে বিদেশে পাড়ি জমাচ্ছে। আমাদের দেশের শল্য চিকিৎসকদের হার্নিয়া অপারেশনে যথেষ্ট দক্ষতা রয়েছে। এ ব্যাপারে জনসাধারণকে সচেতন করা প্রয়োজন।

দেশের বিভিন্ন স্থানে যারা এ রোগে ভুগছেন, তারা শল্য চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে পারেন। অত্যন্ত ভালো চিকিৎসা আমাদের দেশের চিকিৎসকদের নিশ্চিত করতে পারেন, এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। করিমুল্লাহর কথাই বলি- তার হার্নিয়ার কত জটিলতা হয়েছিল। আমাদের চিকিৎসকদের প্রচেষ্টায় তিনি ভালো হয়ে স্বাভাবিক জীবনযাপন করছেন। তার কোলে এক ছোট সোনামণি এসেছে। অপারেশনের পর তিনি নিয়মিত চিকিৎসকের সাথে যোগাযোগ রাখছেন ও তাঁদের পরামর্শ মতো চলছেন। স্বী-সন্তান, আত্মীয়-স্বজন নিয়ে তিনি আজ পরম সুখী।

## সত্যজিতের সত্য রক্ষা



গ্রামের এক অত্যন্ত গরিব ঘরে জন্ম সত্যজিতের। ছোটবেলা থেকে বিভিন্ন কাজ-কর্মে মেধার পরিচয় দিয়েছেন। স্কুলের প্রধান শিক্ষক তাঁকে ডাবল প্রমোশন দিয়ে মেধার মূল্যায়ন করেছেন। গ্রামে একবার কলেরা মহামারী আকার ধারণ করে। চোখের সামনেই পরিবারের দুজন সদস্য কলেরায় মারা গেলে তাঁর মন অত্যন্ত ব্যথিত হয়ে পড়ে। প্রতিজ্ঞা করেন, ভবিষ্যতে ডাক্তার হয়ে বাস্তিত মানুষের সেবা করবেন। সিনিয়র ভাইদের পুরোনো বই-খাতা জোগাড় করে আদাজল খেয়ে নেমে পড়েন বিদ্যার্জনে। অত্যন্ত কৃতিত্বের সাথে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা পাস করে সরকারি মেডিকেল কলেজে ডাক্তারি পড়ার সুযোগ পেয়ে যান সত্যজিত।

পরের বছরগুলো কেটে গেল দ্রুত। কৃতিত্বের সাথে ডাক্তারি পাশ করলেন সত্যজিৎ। বছর দুয়েক চাকরি করেন সরকারি হাসপাতালে। বিদেশ যাওয়ার ডাক এল। সরকারি বৃত্তি পেয়ে উচ্চ শিক্ষার জন্যে বিদেশে পাড়ি জমান। শিক্ষা শেষে নিজ এলাকায় এসে চিকিৎসাসেবায় মনোনিবেশ করেন সত্যজিৎ। গ্রামের সবাই বলে, ধন্য ধন্য। তিনি আজ প্রতিষ্ঠিত চিকিৎসক। চিকিৎসাজীবনের শুরুর দিকের ঘটনাপ্রবাহ আজও তাঁকে বিচলিত করে।

বেপারি পাড়ার আনোয়ার সাহেবের ছোট ফুটফুটে মেয়ে চাঁদনি। বয়স বছর দেড়েক হবে। হাসি-খুশিতে যেন চাঁদের টুকরো। দীর্ঘ দশ বছর পর আনোয়ার সাহেবের ঘরে একমাত্র অতিথি সে। গলায় সোনার চাঁদ পরিয়ে সবাই নাম রেখেছে 'চাঁদনি'। অনেক টাকা-পয়সা খরচ করে এলাকার সবাইকে জোড়া গরু আর খাসি

জবাই করে দাওয়াত খাওয়ান। সবার কাছে চাঁদনি খুব আদুরে। আলাপ করতেই ফিক করে মিষ্টি হাসি দেয়। যেন পূর্ণিমার চাঁদের আলোয় সবার মন ভরে যায়।

মাসছয়েক হলো বাবা আনোয়ার সাহেব কুয়েত গেছেন। মা পরিবারের সবকিছু দেখাশোনা করেন।

একদিন খুব সকালবেলা। চাঁদনির মা ছুটে এলেন ডা. সত্যজিতের বাড়িতে। চাঁদনির পেটে খুব ব্যথা। সারারাত মা-মেয়ে এতটুকুও ঘুমোয়নি। সত্যজিৎ ঐ এলাকার সবার প্রিয়। চিকিৎসায় যেমন যশ, ব্যবহারও তেমনি মিষ্টি। সবাই তাঁকে খুব সম্মান করে। তাঁর উপর সবার প্রগাঢ় আস্থা। এলাকার যে কেউ অসুস্থ হলে তাঁর পরামর্শ নেন। সত্যজিৎ গ্রামের মাটি ও মানুষকে প্রাণভরে ভালোবাসেন। গ্রামের মেহনতি মানুষের প্রতি রয়েছে তার অসীম মমতা ও কর্তব্যবোধ।

চাঁদনির মা তার স্কুলজীবনের সাথী। চাঁদনির অসুখের কথা শনে তিনি ভারি বিচলিত হয়ে উঠলেন। তাকে শুন্ধ করা চাই-ই চাই। কালক্ষেপণ না করে চাঁদনিকে দেখতে গেলেন। ততক্ষণে বাড়ির লোকজন ও নিকট আত্মীয়রা চাঁদনির বাড়িতে ভিড় জমিয়েছে। চাঁদনি দাদির কোলে। খুব কাদছে। দাদি অনেক আদর করছে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হচ্ছে না। মাঝে মাঝে পা দুটো গুটিয়ে গা মোচড়ে বেশ জোরে কেঁদে ওঠে। পরক্ষণে রক্ত-পায়খানা করে। এরপর নিস্তেজ হয়ে পড়ে। মাঝে মাঝে বমিও করে। এভাবে কেটে গেল একরাত। একবারেই দুর্বল হয়ে পড়েছে চাঁদনি। সত্যজিৎ তাকে দাদির কোলেই যথাসম্মত পরীক্ষা করলেন। উৎকৃষ্টিত আত্মীয়-স্বজন তখন অনেক কিছুই বলতে শুরু করলো। কেউ বললো, জিন-পরীর আঁহড় লেগেছে, কেউবা বলছে বাজে লোকের মুখ পড়েছে। আবার কারো মতে চাঁদনির রক্ত আমাশয় হয়েছে। চাঁদনির জন্যে সবার চিন্তার শেষ নেই।

বাচ্চাদের রোগ সম্বন্ধে সত্যজিতের খুব ভালো একটা অভিজ্ঞতা তখনো হয়নি। তবে বুঝতে পেরেছেন, ওটা রক্ত আমাশয় নয়। খুব একটা ঝুঁকি নেয়া ঠিক হবে না। চাঁদনির মাকে ডেকে বললেন-

- চাঁদনিকে শহরে বড় হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে।

- যা ভালো তাই করুন, ডাক্তার সাহেব।

সবাই শহরে যাবার জন্যে দ্রুত তৈরি হয়ে নিল। ঘরের পাশে বড় খাল। ঘাটে নৌকা এসে ভিড়ল। জোয়ারের পানিতে খাল কানায় কানায় পূর্ণ। চাঁদনি দাদির কোলে। নাদিয়া, তার ছোট ভাই রকিব আর সত্যজিৎ নৌকা করে বাসস্ট্যান্ডে এসে পৌছল। বাসে চড়ে শহরের বড় হাসপাতালে পৌছল তারা। বেলা তখন ১টা। সবাই খুব চিন্তিত। চাঁদনি আরো দুর্বল হয়ে পড়েছে।

চাঁদনিকে হাসপাতালে ভর্তি করাতে সত্যজিতের তেমন বেগ পেতে হয়নি। ওখানে তাঁর ডাক্তার বন্ধুরা কাজ করেন। তারপর? চাঁদনির অপারেশন হলো। ডাক্তারদের অনেক চেষ্টায় মৃত্যুর সাথে যুক্ত করে সুস্থ হয়ে উঠল চাঁদনি। প্রায়

পদ্ধকাল মা নাদিয়া, দাদি ও অনেকের নিদ্রাহীন রাত কেটেছে। মঙ্গল-অমঙ্গল কত কিছুই ভেবেছে। প্রতিজ্ঞা করেছে সুস্থ হলে গরিব-দুঃখীদের দান-দক্ষিণা দেবে।

চাঁদনির কী অসুখ হয়েছিল তা জানার কৌতুহল জাগছে নিশ্চয়ই! তার যে রোগ হয়েছিল তার নাম ইনটাসাসসেপশন অর্থাৎ অন্তের ভেতর অস্ত্র ঢুকে যাওয়া।

এ রোগ সাধারণত ছোট বাচ্চাদের হয়ে থাকে। খুব ছোট বয়সের বাচ্চাদের ক্ষেত্রে এ রোগ পরিলক্ষিত হয় বেশি। মেয়ে বাচ্চাদের চেয়ে পুরুষ বাচ্চারা বেশি আক্রান্ত হয়। এর সঠিক কারণ এখনো বিজ্ঞানীদের অজানা। পরিণত বয়সেও এ রোগ হতে পারে। এ ক্ষেত্রে অন্তের টিউমার, অনেক ডাট্টাভাবটিকুলাম ইত্যাদি কারণে তা হতে পারে।

বাচ্চাদের এ রোগে আক্রান্ত হওয়ার আগে সর্দি-কাশি, জুর, ডায়রিয়া ইত্যাদি উপসর্গ দেখা দিতে পারে। তবে রোগের শুরু হঠাৎ পেট ব্যথার লক্ষণ নিয়েই। ব্যথার সময় বাচ্চা মলিন হয়ে যায়, খুব কান্নাকাটি করে। ব্যথা কমে গেলে বাচ্চা অনেকটা দুর্বল হয়ে পড়ে। এভাবে পর্যায়ক্রমে ব্যথার পরপরই আমাশয়-যুক্ত রক্ত-পায়খানা হয়। বাচ্চার খাওয়া-দাওয়া বন্ধ হয়ে যায় ও বমি করে। একসময় বাচ্চার মাঝা-পেটে টিউমারের মতো চাক দেখা যায়। শারীরিক অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হয়ে যায়। এসব লক্ষণ দেখা দিলে অবশ্যই অন্তের ভেতর অস্ত্র ঢুকে গেছে এমনটি সন্দেহ করতে হবে। অনেক সময় পায়খানার রাস্তা দিয়ে অন্তের জটলা বের হতে দেখা যায়।

অনেকে এ ধরনের রোগকে রক্ত আমাশয়, ডায়রিয়া, গোল কৃমির আক্রমণ, বদহজম ইত্যাদি সন্দেহ করেন। তাই কৃমি, আমাশয়, ডায়রিয়ার বিভিন্ন ওষুধ খাওয়ানোর পরামর্শও দিয়ে থাকেন। সঠিকভাবে রোগ নির্ণয় না করে সন্দেহের ওপর ভিত্তি করে এসব ওষুধ সেবন অবশ্যই ক্ষতিকারক। এতে প্রাণহানি পর্যন্ত ঘটতে পারে।

তবে কী পদক্ষেপ নিতে হবে?

বাচ্চাকে অবশ্যই শিশু বিশেষজ্ঞের কাছে নিয়ে যেতে হবে। শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ ভালোভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবেন। প্রয়োজনে পেটের এঞ্চ-রে, পায়খানা পরীক্ষা, পেটের আলট্রাসনোগ্রাফি করাতে পারেন। শিশুরোগের সার্জনের পরামর্শও নেয়া যেতে পারে।

ঘনঘন পাতলা পায়খানা হলে শিরার মাধ্যমে স্যালাইন দিতে হয়।

মনে রাখতে হবে, ঘন ঘন পাতলা পায়খানা হলে শিশুদের সহজেই লবণ ও পানির ঘাটতিজনিত মারাত্মক সমস্যার সৃষ্টি হয়। সময়মতো উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে না পারলে কিডনির কাজ ব্যাহত হয়। এক সময় বাচ্চার প্রস্তাব বন্ধ হয়ে যায়। কিডনি অচল হয়ে পড়ে। বাচ্চার প্রস্তাব অত্যন্ত কমে গেলে বা প্রস্তাব না হলে কিডনির কাজ করছে না এমনটি ধারণা করতে হবে।

তাই এ ধরনের জটিলতা যাতে সৃষ্টি না হয় সেদিকে নজর দিতে হবে। বমি হলে প্রথমে খাবার স্যালাইন খাইয়ে বাচ্চার শরীর সতেজ রাখতে হবে। বমি বেশি হলে শিরার মাধ্যমে বেবি স্যালাইন দিতে হবে।

অন্তরের ভেতর অন্ত ঢুকে যাওয়া ছোট ছোট বাচ্চার এক মারাত্মক রোগ। যথাযথ পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে এ রোগ সময়মতো নিরূপণ করা জরুরি। প্রাথমিক অবস্থায় এ রোগ নিরাময়ে অপারেশন দরকার হয় না। তবে জটিলতা দেখা দিলে অপারেশন করতে হয়। অপারেশন যথাযথভাবে সম্পন্ন হলে এর ফলাফল চমৎকার।

চাঁদনির রোগ নিরূপণে কিছু সময় বেশি ব্যয় হয়েছে সত্য। তবে সঠিক চিকিৎসা হওয়াতে সে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়েছে। চাঁদনি এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী। চোখে তার বড় হওয়ার স্বপ্ন। তার মা আজও ছোটবেলাকার কষ্টের কথা মনে করে কাঁদে। চাঁদনি আরোগ্য লাভ করায় স্রষ্টার কাছে কৃতজ্ঞতা জানান।

সত্যজিৎ গত বছর সিলেট মেডিকেলে বদলি হয়েছেন। নাদিয়ারা প্রায়ই তাকে স্মরণ করে। কৃতজ্ঞতায় ভরে ওঠে ওদের বুক। দীর্ঘশ্বাস ফেলে। চাঁদনি আজ দেশ নিয়ে ভাবে। সুযোগ পেলে গ্রামের মাটি ও মানুষের কাছে ছুটে যায়। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে, পড়ালেখা শেষ করে গ্রামের সুবিধাবধিত মানুষের জন্য কিছু করবে।

## রমজান আলীর শৈশব-বেদনা



রমজান আলী গ্রামের এক গরিব ঘরের সন্তান। ছোটবেলায় মাকে হারিয়েছে। তাকে আজও খুব মনে পড়ে। মায়ের স্মৃতি মনে পড়লে অশ্রু ঝরে নিভৃতে। বাবা পঞ্চাশ অবধি বাঁচলেও পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হয়ে দীর্ঘদিন শয্যাশায়ী ছিলেন। এক সময় কোমরের পেছন দিকে দেখা দিল দুর্গকময় বেশ বড় একটি ঘা। দারু-টোনার বৈদ্য এসে ঝাড়-ফুঁক করে নাকি পোকা ফেলে—গেছে বেশ কয়েকবার। কাজ হয়নি। ঘায়ের বিষে মারা গেলেন বাবা। অল্প বয়সে অসহায় হয়ে পড়ল রমজান আলী।

পেট চালাতে পাড়ি জমাল ঢাকা শহরে। সন্তানখানেক ছোটাছুটির পর হোটেল বয়-এর চাকরি জুটল। মাইনে দৈনিক দশ টাকা। থাকা-খাওয়া মালিকের খরচায়। বয়স তখন তের। সারাদিন খাটিতে হতো, এমনকি গভীর রাত অবধি। মনে মনে লালন করত বড় হওয়ার গভীর বাসনা। কাজ শেষে গভীর রাত পর্যন্ত পড়াশোনা করত।

বর্ষণমুখের এক গভীর রাতের কথা। কাজ শেষে ছোট টেবিল ল্যাম্পটা জ্বালিয়ে লেখাপড়া করতে বসল রমজান। অংকের অনুশীলনী প্রায় শেষ। হঠাৎ পেট ব্যথা অনুভব করল। ব্যথা বাড়তে লাগল। আঁত-মোচড়ানো তীব্র ব্যথায় কাতরাতে থাকে সে। 'মা মা' বলে ডেকেছে কতবার। গভীর রাতে কে শোনে তার কান্না! বৃষ্টির শব্দে মিশে যায় সবকিছু। পাশে বিছানায় দিনের হাড়ভাঙ্গা খাটুনিতে ঝুঁস্ত সাহেব মিএঢ়া গভীর নিদ্রায় মগ্ন। সেও তার কান্না শুনতে পেল না। অসহ্য যন্ত্রণায় ছটফট করে কাটাল সারারাত। গরম জল আর সামান্য লবণ মুখে দিয়ে ব্যথা থেকে পরিত্রাগের চেষ্টা করেছে বেচারা। বমি করে করে অনেকটা দুর্বল হয়ে পড়ে সে।

সকালে হোটেলের অদূরে ওয়ুধের দোকানের কম্পাউন্ডার সাহেবের কাছে কেঁদে কেঁদে সব কিছু বললো। কম্পাউন্ডার দয়া পরবশ হয়ে তাকে সরকারি জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করিয়ে দিলেন। ওখানেও দু-দুবার বমি করল। বমির সাথে বের হলো গুটিকয়েক কেঁচোসদৃশ বড় গোল কূমি। পাশের বেডের রোগীরা নাক ধরে চোখ ঢাকল। ডাক্তার সাহেব সব বুঝলেন। গোল কূমির আক্রমণ। দেখতে দেখতে রমজান আলীর পেট অনেকটা ফুলে ফেঁপে গেল। পেটের মাঝখানে দেখা দিল বড় একটা চাক। ডাক্তারের পরামর্শে নার্স এসে রাত্রে কূমির ওয়ুধ খাইয়ে দিল। সকালে পায়খানার রাঙাম ভুস দিল। অনেকগুলো গোল কূমি পায়খানার সাথে বের হলো। রমজান আলী ব্যথামুক্ত হয়ে যেন ফিরে পেল নতুন জীবন।

এবার নিশ্চয় ধারণা করতে পারছেন রমজান আলীর কী হয়েছিল! গোল কূমির আক্রমণ। এমনতর দুষ্ট ব্যাধি সম্বন্ধে সবারই জানা প্রয়োজন।

কূমি পরজীবী প্রাণী। এরা বিভিন্ন ধরনের। যেমন : গোল বা কেঁচো কূমি, বক্র কূমি, ফিতা কূমি ইত্যাদি। মানুষের অঙ্গ, যকৃৎ ও মাংসপেশিতে বসবাস করে এরা। যকৃতে বসবাসকারী কূমি ও বক্র কূমি আকারে খুব ছোট। আবার কোনো কোনো কূমি বেশ কয়েক ফুট লম্বা। এদের নাম ফিতা কূমি। বড় বিচিত্র এদের জীবন-চক্র।

গোল কূমির ডিম পায়খানার সাথে বের হয়। দৃষ্টিত খাদ্য বা পানীয়ের সাথে তা পাকস্থলীতে প্রবেশ করে। ডিম ফেঁটে বের হয় কীট। এরা পাকস্থলীর ঝিল্লি ছেদ করে চলে আসে রক্তপ্রবাহে। একসময় চলে আসে ফুসফুসে। ফুসফুসে বায়ুখলির পাতলা আবরণ ভেদ করে আরোহণ করে শ্বাসনালীতে। এরপর খাদ্যনালি বেয়ে চলে আসে আবার পাকস্থলীতে। অন্তে এসে বসবাস শুরু করে। বড় হয়ে অন্তে ডিম পাড়ে। মলের সাথে ডিম বের হয়। দৃষ্টিত খাদ্যের সাথে আবার তা আমাদের দেহে প্রবেশ করে। এভাবে চলতে থাকে এদের জীবন-চক্র।

জীবন-চক্রের বিভিন্ন পর্যায়ে গোল কূমি মানুষের দেহে সৃষ্টি করে বিভিন্ন শারীরিক সমস্যা।

অন্তে এদের সংখ্যা অনেক বেশি হলে দেখা দেয় পুষ্টিহীনতা। বাচ্চারা তাতে আক্রন্ত হয় সবচেয়ে বেশি। এদের পেট বড় হয়ে যায়। খাদ্য অনীহা জন্মে। অখাদ্য-কুখাদ্য যেমন : মাটি, কয়লা ইত্যাদি খাওয়ার আগ্রহ দেখা দেয়। পায়খানার বিভিন্ন অনিয়ম যেমন : পাতলা পায়খানা, ঘন ঘন পায়খানা ইত্যাদি হতে পারে। পুষ্টির অভাব হয় ও স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়।

আবার কখনোবা পেটে এদের সংখ্যা এত বেশি হয় যে এরা জড়ো হয়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে বড় বড় জটলার সৃষ্টি করে। তখন পেট মোচড়ানো ব্যথা হয়। ছোট বয়সের বাচ্চাদের এ ধরনের সমস্যা জটিল আকার ধারণ করতে পারে। এমনকি মৃত্যুবুঝিও দেখা দিতে পারে।

কখনোবা গোল কূমি পিস্তনালিতে ও পিস্তথলেতে চুকে পড়ে। তাতে পেটে অসহ্য ব্যথা হয়। জুর, জডিস ইত্যাদি উপসর্গও দেখা দেয়। রক্তে এদের বাচ্চার উপস্থিতির কারণে শরীরে অ্যালার্জিজাতীয় সমস্যার সৃষ্টি হয়। ফলে চামড়ায় এক ধরনের লালচে দানা দেখা দেয় ও শরীর চুলকায়।

এরা ফুসফুসের বায়ুথলির পাতলা আবরণ ভেদ করে বের হয়। এ সময় কাশি, জুর, কফের সাথে রক্ত যাওয়া ইত্যাদি উপসর্গ দেখা দিতে পারে। অনেকে তা শ্বাসনালির ইনফেকশন কিংবা নিউমোনিয়া বলে ধারণা করতে পারেন। এ ছাড়া কূমি অন্তে অপারেশনের জায়গায় বিভিন্ন ধরনের জটিলতার সৃষ্টি করে।

বাচ্চাদের হঠাতে পেটে ব্যথা, বমি, বমির সাথে গোল কূমি বের হলে গোল কূমির আক্রমণ হয়েছে এমনটি ধারণা করা যেতে পারে। রোগের সঠিক ইতিহাস জেনে যথাযথ পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে সঠিকভাবে এ রোগ নিরূপণ সম্ভব। সময়মতো ও উপযুক্ত চিকিৎসায় এ রোগ নিরাময় হয়। বিভিন্ন জটিল সমস্যার সৃষ্টি হয় না।

হঠাতে পেটের উপরের অংশে অসহ্য মোচড়নো ব্যথা এবং বুকে ও পেছনে শিরদীড়ায় এ ব্যথা ছড়িয়ে পড়লে গোল কূমি পিস্তথলেতে বা পিস্তনালিতে চুকেছে এমনটি ধারণা করতে হবে। আলট্রাসনোগ্রাফি নামক পরীক্ষার সাহায্যে তা সঠিকভাবে নির্ণয় করা সম্ভব।

কারো কারো ধারণা, খাদ্য পরিপাকে এদের উপস্থিতি অত্যাবশ্যক। এ ধারণা সঠিক নয়। গোল কূমি কোনো ধরনের পাচক রস নিঃসৃত করে না বা অন্য কোনোভাবে খাদ্য পরিপাক প্রক্রিয়ায় সহায়তাও করে না। এদের নির্মূল করাই শ্রেয়। তবে এদের সম্পূর্ণভাবে নির্মূল করা অনেকটা কঠিন কাজ। কারণ আমাদের দেশের প্রাকৃতিক পরিবেশ এদের জীবন-চক্র দ্রুত আবর্তনে অত্যন্ত সহায়ক। যেসব কারণে এর বংশবিস্তার ঘটে ও আমাদের শরীরে বিভিন্ন রোগের সৃষ্টি করে তার কয়েকটা নিচে উল্লেখ করা হলো :

১. সাধারণ স্বাস্থ্যবিধি মেনে না-চলা।
২. যেখানে-সেখানে মলমৃত্র ত্যাগ করা।
৩. বিভিন্ন কাজে ও পানীয় হিসেবে দৃষ্টিত পানি ব্যবহার করা।
৪. দাঁত দিয়ে নখ কাটা, আঙুল চোষা ইত্যাদি কু-অভ্যাস থাকা।
৫. ভালোভাবে না ধুয়ে খাদ্য উপকরণ রান্না করা।
৬. ফলমূল ভালোভাবে না ধুয়ে খাওয়া।
৭. উপকরণ ভালোভাবে না ধুয়ে সালাদ তৈরি করা।
৮. অপরিচ্ছন্ন পরিবেশে খাদ্য গ্রহণ করা।
৯. নিয়মিত কৃমিনাশক ও শুধু সেবন না করা।
১০. বাসস্থান ও আশপাশের পরিবেশ পরিকার-পরিচ্ছন্ন না রাখা।

আমাদের দেশের জলবায়ু গোল কৃমির বিশ্বিস্তারে খুব সহায়ক। আমাদের ও বন্ধি এলাকার বাসিন্দাদের গোল কৃমিজনিত সমস্যা অপেক্ষাকৃত বেশি। এর আক্রমণ থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে উপরোক্ত কু-অভ্যাসসমূহ পরিত্যাগ করতে হবে এবং পাশাপাশি স্বাস্থ্যবিধি যথাযথভাবে মেনে চলতে হবে। প্রতিটি স্কুল, কিডারগার্টেনে বাচ্চাদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে প্রয়োজনমতো কৃমিনাশক ও ঔষধ খাওয়াতে হবে। সেই সাথে স্বাস্থ্যবিধি সম্বন্ধে ছাত্রদের যথাযথ জ্ঞানদান ও প্রশিক্ষণ দিতে হবে।

বছরে অন্তত কয়েকবার এদের স্বাস্থ্য ও মল পরীক্ষা করে কৃমিনাশক ও ঔষধ খাওয়ানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

আমাদের দেশের জাতীয় স্বাস্থ্যনীতিতে এ সমস্যা সম্পর্কে আলোকপাত করা দরকার। স্কুলের পাঠ্যপুস্তকে এ সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রবন্ধ সন্নিবেশ করে ছাত্রছাত্রীদের স্বাস্থ্যসচেতন করে তুলতে হবে। ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় সেমিনার-সিম্পোজিয়াম ইত্যাদির মাধ্যমে গোল কৃমিজনিত সমস্যা সম্বন্ধে সাধারণ জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে।

বর্তমানে গোল কৃমির আক্রমণের চিকিৎসায় পিপারেজিন সাইট্রেট, এলবেডাজোল, মেবেডাজোল, লিভামিসল ইত্যাদি ঔষধ ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং এর সৃষ্টি জটিলতায় বিভিন্ন আধুনিক চিকিৎসা ও কার্যকরী ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। আমাদের অর্থনীতি, সামাজিক অংগুষ্ঠি, নাগরিক স্বাস্থ্য ইত্যাদির ওপর এর বিরূপ প্রভাব রয়েছে বিধায় এ সমস্যা সমাধানে জাতীয়ভাবে সঠিক ও কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে।

গোল কৃমি ও এর সৃষ্টি স্বাস্থ্য-সমস্যা সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা ইতিমধ্যে পাওয়া গেছে। বাচ্চাদের ক্ষেত্রে এ সমস্যা মৃত্যুরূপে সৃষ্টি করতে পারে। শৈশবে রমজান আলীর হঠাৎ পেটের ব্যথা গোল কৃমির জটলা পাকানোর ফলে সৃষ্টি হয়েছিল। কপাল ভালো, ডাঙ্গার সাহেবের প্রচেষ্টায় সে তা থেকে মুক্তি পেয়েছে। কষ্টের ঐ দিনগুলো আজও রমজান আলীর মনে পড়ে। বর্তমানে সে সরকারি স্বাস্থ্য অফিসে চাকরি করে। বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে সে কৃমি-সৃষ্টি সমস্যা সম্বন্ধে জনসাধারণকে সর্তর্ক করে দেয়।

## কুসুমের কষ্ট



বছর পাঁচেক আগের কথা। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করত মেধাবী ছাত্রী কুসুম। গ্রীষ্মের ছুটিতে বন্ধুদের নিয়ে দিনকয়েক কাটিয়ে এল প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি কञ্চবাজার। বাড়ি ফিরে বেশ খোশবোজাজে ছিল। সাগর-জলে প্রতিদিনের সন্নান, কূল-আঁছড়ে পড়া চেউয়ের মনমাতানো শব্দ, সমুদ্রসৈকতের তাজা হাওয়ার কোমল পরশ, সূর্যাস্তের অপরাপ দৃশ্য সবই তার মনে দোলা দেয়। তাবে, এমন সুন্দর সোনালি দিন আবার কবে আসবে! কিছুতেই তার ঘূম আসে না।

রাত শেষে ভোর হলো। জানালার পর্দা ভেদ করে আসা সূর্যের মিষ্ঠি আলোয় আলোকিত হলো শয়নকক্ষ। আলোয় আলোয় ভরে গেল চারদিক। দরজার রঙিন পর্দা সরিয়ে ঘরে ঢুকলেন মা। হাতে গরম চা। মিষ্ঠি কঢ়ে বললেন, ‘ওঠ মা, বেলা তো কম হয়নি’।

মৃদুপায়ে কুসুম এগিয়ে এল। চায়ের কাপে চুমুক নিতেই কেমন যেন পেটে ব্যথা অনুভব করল। চা পান আর হলো না। আবার শয়ে পড়ল। ব্যথা ক্রমেই বাড়তে লাগল। ভাবল বদহজম হয়েছে। টুক করে দুটো হজমি বড়ি গিলে নিল। বিছানায় এপাশ-ওপাশ করে কাটাল আরো কিছু সময়। ব্যথা কমল না। দু'বার বমি হলো। মা মরিয়ম সবই লক্ষ করলেন। বুবাতে পারলেন কুসুমের পেটে মারাত্মক কিছু হয়েছে। ভারি কষ্ট হচ্ছে। জরুরি ডাক্তার ডাকা দরকার।

ডাক্তার রসিদ চৌধুরী কুসুমদের ঔষিতেশী। এলাকায় বেশ নামতাক। শবে মাত্র ঘূম থেকে উঠেছেন। ড্রাইং রুমে সোফায় বসে চা পান করছিলেন। হাতে ত্রি

দিনের সংবাদপত্র। লাল হরফের হেড লাইন তার নজরে পড়ল : ‘বাংলার গ্যাস আকাশে জুলছে। গৃহিণীরা গ্যাসের চুলো জুলিয়ে রাখেন সারাক্ষণ’। দেশের সম্পদের এমন অপচয়! খুব কষ্ট লাগল। চোখ তুলতেই দেখলেন, দরজায় দাঁড়িয়ে কুসুমের মা মরিয়ম। সাথে কুসুম ও কয়েকজন আত্মীয়স্বজন। ভেতরে আসতে বললেন।

— ভোর থেকে কুসুমের পেট ব্যথা, বমি আর জ্বর। প্রিজ আমার কুসুমকে একটু দেখুন।

— অবশ্যই।

কুসুম ব্যথায় কাতর। সবাই ভারি চিন্তিত। যেন আকাশে হঠাৎ ঘন-কালো মেঘ, বজ্রপাতের ভয়ংকর ধ্বনি। কিসের যেন অশনি সংকেত!

কুসুমের পেট ব্যথার বিবরণ শুনে তাকে ভালোভাবে দেখলেন ডাক্তার। তার শিরা খুব দ্রুত চলছে। জিহ্বা শুকিয়ে যাচ্ছে, গায়ে জ্বর, তলপেটের ডান দিকে খুব ব্যথা। ডা. সাহেবের বুঝতে কষ্ট হলো না কুসুমের কী রোগ হয়েছে। বিনয়ের সাথে বললেন, ‘ওকে জরুরিভাবে হাসপাতালে ভর্তি করানো প্রয়োজন। পরীক্ষা-নিরীক্ষার দরকার। অপারেশনের প্রয়োজন হতে পারে’।

মরিয়ম খুব চিন্তায় পড়ে গেলেন। দু'দিন পর কুসুমের গায়ে হলুদ।

কুসুমকে শহরে এক বড় হাসপাতালে ভর্তি করানো হলো। ঘণ্টাখানেক পর পরীক্ষা-নিরীক্ষার রিপোর্ট হাতে এল। ডা. রশিদ সাহেবের পরামর্শে মহিলা রোগ বিশেষজ্ঞের মতামতও নেয়া হলো। উনারও সেই একই কথা, জরুরি অপারেশন দরকার। মরিয়ম বেশ চিন্তায় পড়ে গেলেন। সবিনয়ে বললেন,

বলেন কি ডাক্তার সাহেব! আপাতত ওষুধ দিন। দু'দিন পরে ওর গায়ে হলুদ।

কুসুমের অসুস্থতার কথা বরপক্ষের কানে গেল। এগিয়ে এল বরপক্ষ। উনাদের সহায়তায় ঐ দিনই কুসুমের অপারেশন হলো। সগুহ খানেকের মধ্যে সেরে উঠল সে। কুসুমের গায়ে হলুদ পেছালা। সময়মতো বিয়েও হলো।

কুসুমের একিউট অ্যাপেনডিসাইটিস হয়েছিল। একিউট অ্যাপেনডিসাইটিসের অর্থ— ভারমিফরম অ্যাপেনডিকসের হঠাৎ প্রদাহ। এই রোগ হলে অনেক ক্ষেত্রে জরুরি অপারেশন দরকার। নতুনা জটিল সমস্যার উভব হতে পারে।

ভারমিফরম অ্যাপেনডিকস কী। কেনইবা এর হঠাৎ প্রদাহ। এর হঠাৎ প্রদাহ হলে কি কষ্ট হয় এবং কী কী ব্যবস্থা নিতে হয়, এসব বিষয় জানা দরকার।

ভারমিফরম অ্যাপেনডিকস আমাদের বৃহদত্ত্বের শুরুর অংশ সিকামসংলগ্ন কেঁচোসদৃশ ছোট্ট একটা অঙ্গ। তলপেটের ডানদিকে এর স্বাভাবিক অবস্থান। শরীরে এর কী কাজ তা বিজ্ঞানীদের কাছে এখনো স্পষ্ট নয়। তবে এর বিভিন্ন রোগে তা কেটে বাদ দিলে শরীরের তেমন কোনো ক্ষতি হয় না কিংবা কোন পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াও দেখা যায় না। তাই বলে অযথা এর অপসারণেরও প্রয়োজন নেই। ক্ষেত্রবিশেষে

এটি খুব কাজে লাগে। যেমন: ডানদিকের মূর্তনলের নিচের অংশ বিভিন্ন রোগে নষ্ট হলে তা কেটে বাদ দিয়ে ঐ জায়গায় ভারমিফরম অ্যাপেনডিকস জুড়ে দেয়া যায়। এছাড়া অথবা অপসারণ করলে অপারেশন পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন সমস্যারও সৃষ্টি হতে পারে। কারো কারো মতে, রোগ প্রতিরোধে এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তবে তার সমক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ এখনো নেই।

একিউট অ্যাপেনডিসাইটিসের মৃদু আক্রমণ অনেক সময় ওষুধ প্রয়োগে সেরে যায়। অপারেশনের দরকার হয়না। অতএব বলা যায় সব একিউট আপেনডিসাইটিসের রোগীকে অপারেশন করা যাবে না।

রোগ-জীবাণুর সংক্রমণে বা অন্য কোনো কারণে এর হঠাত প্রদাহ হলে একে আমরা একিউট অ্যাপেনডিসাইটিস বলি। যৌবন ও মধ্যবয়সের পুরুষ এবং মহিলা উভয়ই সচরাচর এ রোগে বেশি আক্রান্ত হয়। খুব ছোট-বয়সে ও একেবারে বৃদ্ধ বয়সে এ রোগের আক্রমণগ্রস্ততা অনেকসাংশে কমে যায়। তবে একবার আক্রান্ত হলে আক্রান্ত ব্যক্তিরা মাসকয়েক পরপরই এ রোগে আক্রান্ত হতে পারে।

পৃথিবীর সব দেশের লোকেরাই এ রোগে আক্রান্ত হয়। তবে এশিয়া মহাদেশের লোকদের তুলনায় ইউরোপ ও আমেরিকার অধিবাসীরা এ রোগে আক্রান্ত হয় অনেক বেশি। কারণ হিসেবে বলা যায়: অতিমাত্রায় মাংস ও শুক্র তৈরি-খাবার গ্রহণ অথবা বংশগত কোনো যোগসূত্র। বছরের সব ঋতুতেই এ রোগ পরিলক্ষিত হয়, তবে গ্রীষ্মে এ রোগের আক্রমণ অপেক্ষাকৃত বেশি।

কারণ যাই হোক, এই রোগের লক্ষণ ও চিকিৎসাব্যবস্থার তেমন বিশেষ কোনো বড় বৈষম্য নেই। রোগের সাধারণ লক্ষণগুলো হচ্ছে: হঠাত মধ্যপেটে অর্থাৎ নাভির চারপাশে মোচড়ানো ব্যথা, বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া, গায়ে জ্বর, খাদ্যে অরুচি ইত্যাদি। অনেক সময় আক্রান্ত ব্যক্তি এ ধরনের সমস্যাকে বদহজম ভেবে হজমি বড়ি কিংবা অ্যান্টাসিড জাতীয় ওষুধ সেবন করেন। তাতে রোগের উপশম তো হয় না বরং তা প্রকটতর হয়।

ঘণ্টা কয়েক পর ব্যথা সরে গিয়ে ডানদিকে তলপেটে স্থায়ী হয়। এ অবস্থায় কালঙ্কেপণ না করে অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ নেয়া শ্রেয়। ডাক্তার রোগীর বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা যেমন: রক্তের সাধারণ পরীক্ষা, বুকের এক্স-রে ও ক্ষেত্র বিশেষে আলট্রাসন্নোগ্রাফি করে সহজে এ রোগ নিরূপণ করেন এবং সময়মতো যথাযথ ব্যবস্থা নেন।

অনেক ক্ষেত্রে জরুরি অপারেশনের প্রয়োজন হয়। অপারেশন-পরবর্তী সময়ে সাধারণত তেমন কোনো জটিল সমস্যার সৃষ্টি হয় না। রোগী সহজে সুস্থ হয়ে ওঠেন। অন্যদিকে সময়মতো অপারেশন না করলে অনেক ক্ষেত্রে তা ফেটে যায়। জীবাণু সারা পেটে এবং শরীরে ছড়িয়ে পড়ে। এ অবস্থায় অপারেশন অনেক ঝুঁকিপূর্ণ। এমনকি মৃত্যুও হতে পারে। এ ছাড়া সময়মতো অপারেশন করা না হলে

অন্যান্য জটিলতা যেমন: পেটে চাক, ফোঁড়া সৃষ্টি হতে পারে। এসবই অত্যন্ত মারাত্মক সমস্যা। এতে রোগীর অনেক শক্তি হয়ে যেতে পারে। এমনকি মৃত্যুও ঘটতে পারে।

তবে অন্যান্য কারণেও পেটে এ ধরনের ব্যথা হতে পারে। প্রস্তাবের ইনফেকশন, ডান মূখ্যনলের পাথর, ডিষ্বাশয় থেকে ডিস্বকোষ বের হওয়ার ফলে ব্যথা, মেয়েদের তলপেটের ইনফেকশন, পেটের অস্বাভাবিক জায়গায় গর্ভপাত, ডিষ্বাশয়ের টিউমার, হঠাৎ মোচড়ে যাওয়া ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। তাই রোগ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে চিকিৎসকরা বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করেন। মহিলা রোগীর ক্ষেত্রে আরো কিছু বাড়তি সতর্কতার প্রয়োজন হয়। ঐসব ক্ষেত্রে মহিলা-রোগ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেয়া শ্রেয়।

জেনে রাখা ভালো, তলপেটের ভান্ডিকে ব্যথা হলেই আপেনডিসাইটিস হয়েছে, এমনটি সব সময় বলা যাবে না।

সঠিকভাবে রোগ নির্ণয় না করে অনুমানের ভিত্তিতে অপারেশন করলে একদিকে যেমন আসল রোগটিরই চিকিৎসা হয় না, অন্যদিকে অপারেশন-পরবর্তী বিভিন্ন জটিলতার সৃষ্টি হতে পারে। বর্তমানে অনেক আধুনিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও যন্ত্রপাতি আবিস্কৃত হয়েছে। ক্ষেত্রবিশেষে তা প্রয়োগ করে সঠিকভাবে এ রোগ নিরূপণ ও যথাযথ চিকিৎসা নিশ্চিত করা যায়।

কুসুম সংগীক চিকিৎসা পেয়েছে। বর-পক্ষের সহদয় মানসিকতা সঙ্গেই প্রশংসনীয়। সংশ্লিষ্ট সবার প্রচেষ্টায় কুসুম আজ সুস্থ ও সুখী। তার স্বপ্ন, পড়াশোনা শেষ করে ভবিষ্যতে খুব বড় ডাক্তার হবে এবং এলাকার গরিব-দুর্ঘটী মানুষের সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করবে।

## খুঁজে ফিরি সেই বুড়ো রোগীটাকে



বছর তিনেক আগের কথা। ছেলের ভর্তির ব্যাপারে ঢাকা গিয়েছিলাম। শুক্রবার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সব অফিস বন্ধ। তেমন কিছু করার ছিল না। ছেলেকে সাথে করে সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধ দেখতে গেলাম। অনেকক্ষণ চারদিক ঘুরে ঘুরে দেখলাম। এখন বেশ কিছুটা ক্লান্ত। পকেটের রুম্মালটা বের করে সিঁড়িতে রেখে তাতেই বসে পড়লাম। ছেলে আমাকে হেঁড়ে ফেরায় গেল বুঝতেই পারিনি।

স্মৃতিসৌধ ঘিরে অনেক কথা মনে পড়ল। '৭১-এর মুক্তিযুক্ত, লক্ষ শহীদের রক্তে ঝরা সেই দিনগুলোর কথা। ..... পাশ ফিরতেই দেখি এক ভদ্রলোক। গলায় ডান্ডারি ঘন্টা ঝুলে আছে। বেশ ক্লান্ত দেখাচ্ছিল তাকে। আবেগজড়িত কঞ্চিৎ বললেন,

— আমাকে চিনতে পেরেছেন। আমি '৭১-এর সেই শহীদ ডষ্টের সালাম।

— ড. সালাম!

আশেপাশে আর কেউ নেই। বেশ ভয় ভয় লাগছিল। গলা শুকিয়ে এল।

— হ্যাঁ, হ্যাঁ, এবার চিনতে পেরেছি। তবে আপনি এখানে!

— সেই বুড়ো রোগীটাকে খুঁজছি। '৭১-এ ওকে অপারেশন করেছিলাম।

— কিছুই বুঝতে পারছি না। এই বুড়ো রোগীটা কে? ও এখানে আসবেই বা কেন? আমি বললাম।

— তা হলে শুনুন, সব খুলে বলছি।

১৯৭১ সাল। শহরের দক্ষিণ প্রান্তে ভাড়া করা এক বাসায় বাস করতাম। ঐ বাসারই নিচের তলার দুটো কক্ষ চেবার বানিয়ে তাতে বিকেলে বাড়তি কিছু রোজগারের ব্যবস্থা করি। বাড়িওয়ালা অবাঙালি। অনেক দিন ধরে বহুমুক্ত আর উচ্চরক্তচাপ রোগে ভুগছিলেন। প্রায়ই তাঁকে দেখতে হতো। তিনি অনেকটা একা। বছর দুয়েক আগে হার্ট-স্ট্রোকে বউ মারা গেছেন। ছেলে বিয়ে করে চলে গেছে আমেরিকা। দু মেয়ে স্বামীর সাথে করাচিতে বাস করে। বড় মেয়ের ঘরে এক নাতনি। সময় পেলে ছেলেমেয়েরা এসে বাবাকে দেখে যেত।

বাসায় কাজের মেয়ে দুটো। দুজনেই আধ বয়সের। এরাই বুড়োর প্রধান অবলম্বন। বুড়োর নিউ মার্কেটে তিনি তিনটো দোকান। নিজে অর্ণের ব্যবসা করতেন। রোগ আর বয়সের সাথে না পেরে এখন ওসব ছেড়ে ছুড়ে দিয়েছেন। বাড়ি আর দোকান ভাড়া যা পান তাতে বেশ ভালোই চলছিল বুড়োর।

ঐ বাসায় আমি দীর্ঘ পাঁচ বছর। বিলেত থেকে পাস করে কস্লটেন্ট সার্জন পদে চাকরি পেলাম সরকারি জেনারেল হাসপাতালে। হাসপাতালে ডাক্তারদের কোনো কোয়ার্টার ছিল না। তাই ভাড়াবাড়িতেই থাকতে হতো আমাকে। বুড়ো আমাকে বেশ স্নেহ করতেন। আমাকে অনেক কিছু খুলে বলতেন। নিচের ঘর দুটোয় চেবার করেছিলাম বলে কিছু মনে করতেন না।

আমি বিয়ে করিনি। বুড়ো প্রায়ই বলতেন, ‘আমার নাতনি খুব সুন্দরী। লম্বা গড়ন, টানা টানা চোখ, ফর্সা, লম্বা কালো চুল। সব মিলে বেশ মানানসই। তোকে নাতনির সাথে বেশ মানাবে’।

- আমি উর্দু জানি না। তোর নাতনির কথা বুঝব কেমনে? মুচকি হেসে বললাম।

- ও খুব ভালো বাংলা বলতে পারে। অনেক দিন আমার সাথে ছিল। আমি ওকে বাংলা শিখিয়েছি। জানিস, নাতনি করাচি ভার্সিটিতে পড়ে। খুব স্মার্ট।

- আমি বাঙালি। ও আমাকে পছন্দ করবে?

- অবশ্যই করবে, তুই ভালো ভাক্তার। ও তোকে করাচি নিয়ে যাবে।

- তবে নাতনিকে নিয়ে এসো।

এসব বলে আমরা দুষ্টুমি করতাম। তাতে অবসর সময় বেশ ভালোই ঘটত।

মার্চে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। বুড়ো চিন্তায় পড়ে গেলেন। প্রায়ই নিচে নেমে আমার চেবারে এসে বসে থাকতেন। বলতেন, ‘আর্মি এলে ওপরে আমাকে ডেকে দিস। ওরা তো জানে না, তুই আমার নাতনিকে বিয়ে করে খুব সহসা করাচি চলে যাবি’।

টেবিলের ঢ্রয়ারে ছেট্ট একটা রেডিও রাখতাম। রাতে ওটা অন করে এবাকী জয় বাংলার খবর শুনতাম। বুড়ো টেরই পেত না। মুক্তিবাহিনী একে একে দেশের অনেক জায়গা শক্রমুক্ত করতে লাগল। অপেক্ষায় ছিলাম আমাদের শহরে কখন

স্বাধীনতার পতাকা উড়বে। চেম্বারে রোগী তেমন ছিল না। তবে হাসপাতালে কাটা-ছেঁড়ার রোগীর কমতি নেই। গুলি খেয়ে আসা অনেক রোগী। ইমারজেন্সি হলে তুরিত যেতে হতো আমাকে। আমার দুই সহকারী ছিলেন। তারাও বাঙালি। বছর তিন আগে এমবিবিএস পাশ করে ঐ হাসপাতালে পোস্টিৎ পেয়েছে। ছোটখাটো অপারেশন ওরাই সেরে ফেলে।

১০ অক্টোবর, ১৯৭১। বিকেল ৫টা। এক বুড়ো রোগী পেট ব্যথা নিয়ে হাজির হলো চেম্বারে। বয়স ষাট হবে। হালকা-পাতলা গড়ন। গায়ে পুরানো সাদা পাঞ্জাবি, পরনে কালো লুঙ্গি। পায়ে চামড়ার পুরোনো স্যান্ডেল। বেশ রোগা দেখাচ্ছিল। বিনয়ের সাথে বললাম,

— বসুন বাবা। কী কষ্ট আপনার?

— গতরাত থেকে পেটে বেশ ব্যথা। দুবার বমি হয়েছে। দেখুন, পেটটা ফুলে ফেঁপে আছে। দুদিন ধরে পায়খানা বন্ধ, হাওয়াও যাচ্ছে না। কী করি। বাবা, আমাকে একটু স্বত্ত্ব দেয়ার চেষ্টা করুন।

বুড়ো অবাঙালি। তবে ভালো বাংলা বলতে পারেন। এক ইমপোর্ট ফার্মে স্বল্প বেতনে চাকরি করেন। সাথে ষেল আঠারো বছরের এক ছেলে। বেশ তাগড়া জোয়ান। বাংলা বোঝে, ভাঙা ভাঙা বলতেও পারে। বুড়োকে দেখা শুরু করলাম। হঠাৎ বুট জুতোর বেশ বড় বড় শব্দ। চার চারজন মিলিটারি এসে চেম্বারে ঢুকে পড়ল।

— ইউ আর মিস্টার সালাম?

— মিস্টার সালাম নয়, আমি ডক্টর সালাম।

— ও সেম কথা, ডক্টর সাব। আপনার সাথে বহুত কথা আছে। টাইম দেনা হোগা?

— হ্যাঁ, বসুন। রোগীটার বেশ কষ্ট হচ্ছে। তাকে দেখে দেই।

— ওসব আপনি করবেন। ও তো আপনার রেসপন্সিভিলিটি।

— অনেক ধন্যবাদ।

রোগী দেখে বুঝলাম, তার বৃহদন্ত্রে প্যাচ লেগেছে। তাকে জরুরি হাসপাতালে ভর্তি করানো দরকার। প্রেসক্রিপশন করে দিলাম। আর্মিদের একজন আমার টেবিলে পা তুলে দিয়ে বলল,

— রোগী দেখা হয়া? এবার বাত করো হামারে সাথ।

মিলিটারির চোখগুলো যেন আগুনে জ্বলছে। রোগী রিকশা নিয়ে হাসপাতালে রওনা হলো।

— ডক্টর সালাম, কাল রাত আপনি যাকে অপারেশন করে গুলি বাহার কিয়া, ও মুক্তি কা লোক হ্যায়। হোয়াই ইউ সেভড হিম? ও আপকা ক্যায়া লাগতা হ্যায়? কাহা গ্যায়া মুক্তি? বলো ডক্টর সাব।

-ও রোগী। ওকে চিকিৎসা করা আমার দায়িত্ব। ও মুক্তি তা তো আমি জানি।

-ডষ্টর, আপনি টেবিলের দ্রয়ারে রেডিও রেখে রাতে চূপি চূপি জয়বাংলার খবর শুনেন। ওসব আমরা জানি। আপনাকে আমাদের সাথে যেতে হবে।

-দেখুন, বুড়ো লোকটার অপারেশন লাগবে। আমার সহকর্মীদের লিখে দিয়েছি সব রেডি করতে। রোগীটার জরুরি অপারেশন না হলে মারা যাবে। আমাকে কিছুক্ষণের মধ্যে হাসপাতালে যেতে হবে। প্রিজ, আমাকে আমার কর্তব্যটুকু করতে দিন। নতুন আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে।

-ঠিক হ্যায় ডষ্টর। তুই খুব ভালো লোক। আল্লাহ বিশ্বাস করিস। তবে এ মুক্তিকে খুঁজে দিতে হবে। তুই নিশ্চয় ওর অ্যাড্রেস জানিস।

-ঠিক আছে, অপারেশন শেষ হলে চেষ্টা করবো।

-বহুত আচ্ছা, ডষ্টর সাব।

আমাকে জিপে করে তারা হাসপাতালে নামিয়ে দিল। ততক্ষণে আমার সহকর্মীরা রোগীর হাতে স্যালাইন লাগিয়েছেন। নাকের ডেতর বিশেষ টিউব দিয়েছেন। প্রস্তাবের রাস্তায় ক্যাথেটার ফিট করেছেন। রোগী কিছুটা আরাম অনুভব করছে। তার পেটের এক্স-রে করানো হলো। অন্যান্য কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষার রিপোর্টের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। রাত আটটার দিকে সবকিছু রেডি করে তাকে অপারেশন করলাম। বুড়োর বৃহদত্ত্বের শেষের কিছু অংশ মুচড়ে গিয়ে তাতে পচন ধরেছে। তা কেটে ফেলে অন্ত্রের দু মাথা পেটের বাম দিক দিয়ে বের করে দিলাম। যথাসময়ে অপারেশন টেবিল থেকে তাকে নামিয়ে রিকভারি রুমে নেয়া হলো। রোগীর ছেলের সাথে বাবার অপারেশন বিষয়ে অনেক আলাপ হলো। বললাম,

- আপনার আকৰা এখন নিরাপদ। তবে মাস দুয়েক পর আরো একটা অপারেশন করতে হবে। তারপর সে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ।

- আপনার রহমত ভুলব না স্যার। আল্লাহ আপনার সহায় হউন।

বুড়োর যে রোগ হয়েছিল তার নাম সিগময়েড ভলভুলাস। সিগময়েড কোলন, আমাদের বৃহদত্ত্বের শেষের দিকের একটা বিশেষ অংশ। এটা দেখতে অনেকটা সিগমা বা ইংরেজি ‘এস’ অক্ষরের মতো। আর সে কারণে বৃহদত্ত্বের এ অংশের নাম হয়েছে সিগময়েড কোলন।

বিভিন্ন কারণে হঠাতে করে সিগময়েড কোলন দুরে মুচড়ে যেতে পারে। জন্মগতভাবে অন্ত্রের ক্রটির কারণে নবজাত শিশুদের বে ধরনের ভলভুলাস হয় তাকে আমরা ভলভুলাস নিওনেটোরাম বলি। আবার জন্মের পর অন্ত্রের বিভিন্ন সমস্যা যেমন: অন্ত্রের সাথে বড় বেডস, সিগময়েডের বড় মেসেন্ট্রি ইত্যাদির কারণে সিগময়েড ভলভুলাসে রোগী আক্রান্ত হতে পারে। পৃথিবীর সব দেশের, সব বয়সের

মানুষের এই রোগ হতে পারে। তবে ইউরোপ ও আমেরিকায় এ রোগ অপেক্ষাকৃত কম। আফ্রিকায় অনেক লোক অধিক মাত্রায় আঁশজাতীয় ভেজিটেবল খান। এ সব লোকের শুদ্ধাঞ্জেও ভলভুলাস হতে পারে।

ভলভুলাসে আক্রান্ত হলে রোগীর হঠাৎ পেটে ব্যথা হয়। পায়খানা ও হাওয়া বের হওয়া বন্ধ হয়ে যায়। পেট ফুলে-ফেঁপে যায়। পরবর্তীতে রোগীর বমি হয়, আহার বন্ধ হয়ে যায়। রোগের সঠিক ইতিহাস নিয়ে বিভিন্ন পরীক্ষার মাধ্যমে এ রোগ নির্ণয় করা অত্যন্ত সহজ। এ ক্ষেত্রে পেটের এক্স-রে, বেরিয়াম এনেমা এক্স-রে ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। কোনো কোনো ক্ষেত্রে বেরিয়াম এনেমা সম্পর্ক করার সুবাদে ভলভুলাসের পাঁচ খুলে যায় এবং আরোগ্য লাভ করে। তবে রোগী আবারও এই রোগে আক্রান্ত হতে পারে। ভলভুলাস পুরোপুরি মুচড়ে গেলে অন্ত্রের ঐ অংশে রক্ত চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। ফলে অন্ত্রের ঐ অংশে পচন ধরে। এ অবস্থায় রোগীর শারীরিক অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হয়ে যায়। শিরা দ্রুত চলে, পায়খানা-প্রস্তাব বন্ধ হয়ে যায়। সময়মতো অপারেশন না হলে মৃত্যুও হতে পারে। বিভিন্ন ধরনের অপারেশন পদ্ধতি অন্ত্রের ভলভুলাসে কার্যকর। শল্য চিকিৎসক নিজেই বিবেচনা করেন, কোন ক্ষেত্রে কোন ধরনের পদ্ধতি কার্যকর হবে।

মনে রাখতে হবে অন্যান্য কিছু রোগেও এ ধরনের পেট ব্যথা অনুভূত হতে পারে। বৃহদ্বন্দের টিউমার, হঠাৎ অগ্ন্যাশয়ের প্রদাহ, বিভিন্ন কারণে অন্ত্রের অবস্থানক্ষণ, ঝুঁড়ো বয়সে কঠিন মল জমে অন্ত বন্ধ হয়ে যাওয়া ইত্যাদি সমস্যা উল্লেখযোগ্য। তবে প্রত্যেকটা রোগেরই বিশেষ কিছু লক্ষণ রয়েছে। তাই রোগের সঠিক ইতিহাস জেনে উপযুক্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে সহজেই এই রোগ নির্ণয় করা সম্ভব। সময়মতো সঠিক পদক্ষেপ নিতে পারলে ফলাফল খুব ভালো।

ভলভুলাসের সেই রোগীটিকে রিকভারি ওয়ার্ড থেকে ঘন্টা তিনেক পর সার্জারি ওয়ার্ডে স্থানান্তরিত করা হলো। দেখি, ওখানে ঐ চারজন উর্দুভাষি মিলিটারি সিস্টারদের সাথে খোশগল্পে মশগুল। আমাকে দেখেই চোখ রাঙিয়ে বলল,

- ভেরি গুড ডেস্টের। অপারেশন সাকসেসফুল! চল, এবার ঐ মুক্তিকে খুঁজে বের করবি। এবার ওকে অপারেশন করতে হবে।

- দেখুন, এই ঝুঁড়ো রোগীটার অবস্থা এখনো খুব একটা নিরাপদ নয়। আমাকে রাতভর এ রোগীর পাশে থাকতে হবে। ওর আরো অনেক চিকিৎসা দরবরার। রোগীর অবস্থা ভালো হলে কাল সকালে আপনাদের সাথে যাব। মুক্তিকে অবশ্যই খুঁজে বের করব। রাতে মুক্তি খোঁজটা খুব একটা নিরাপদ নয়। যে কোনো সময় ওরা আমাদের ওপর ঝাপিয়ে পড়তে পারে। ওরা নিশানা মিস করে না।

- ইট ইস নট পসিবল। তুই মুক্তির লোক। এখন দশটা বাজে। রাত বারোটার আগে মুক্তি খুঁজে বের করবি। নতুনা তোর গর্দান যাবে।

ওটি-ড্রেস পরা অবস্থায় ওরা আমাকে তুলে নিল আর্মি-জিপে। শহরের রাস্তা পেরিয়ে রাজধানীর পথে ছুটে চলল জিপ। মাঝপথে ওরা আমার চোখ বেঁধে

ফেলল। ফিসফিস করে কী সব বলল। বুঝতে পারলাম এখানেই সব শেষ। অন্তিমদূরে সমুদ্রের গর্জন শুনতে পেলাম। ওরা টেনেহিঁচড়ে আমাকে গাড়ি থেকে নামাল। মুহূর্তে অনেকগুলো বন্দুক এক সাথে গর্জে উঠল। তারপর!

মা যেন বলছে, ‘বাবা, এই নে জল। তোর খুব তৃষ্ণা পেয়েছে বুঝি’।

মা লাল-সবুজের পতাকায় আমাকে জড়িয়ে দিল।

হাত ধরে বলল, ‘চল বাবা। সহসা নতুন সূর্য উঠবে। আবার আসবি’।

বাংলাদেশ আজ আমার ঠিকানা। ঘুরে বেড়াই আমি দেশজুড়ে, টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া। খুঁজে বেড়াই ঐ বুড়ো রোগীটাকে, যদি কখনো দেখা হয়। তার সব কাজ আমি সমাপ্ত করতে পারিনি। আরো একটা অপারেশন তার দরকার। বুড়োর ছেলেকে কথা দিয়েছিলাম। তার অঙ্গের দু মাথা জোড়া দিতে হবে।

- আপনার কাছে ওর ঠিকানা আছে?

- না, ওকে আমার চেনার কথা নয়।

- ১৬ ডিসেম্বর, ২৬ মার্চ, ২১ ফেব্রুয়ারির সব মিছিলে, মিটিৎ-এ আমি আপনাদের সাথে আছি। মুক্তিভাইয়েরা কেমন আছে? দেখুন, আমার হাতে লাল-সবুজের পতাকাটা কেমন পতপত করে উড়ছে। দেখতে পাচ্ছেন? আপনাদের কাছে আমার একান্ত অনুরোধ, আপনারা সবাই মিলে এই পতাকার পবিত্রতা রক্ষা করবেন। সময় পেলে ঐ বুড়ো রোগীটারও খৌজ নেবেন।

ইতিমধ্যে ছেলে ফিরে এল। আমার মুখ ধরে বলল, ‘বাবা, অত কী ভাবছ’?

হাতে তার খাবারের দুটো প্যাকেট। পাশ ফিরে দেখি, ডেক্টর সালাম কাছেপিঠে আর নেই।

---







ডা. আশিষ কুমার চৌধুরী। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম এর সার্জারি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক। তিনি একজন লক্ষণ্য শসা চিকিৎসক ও শিক্ষাবিদ। জন্ম: ১৯৫৩ খ্রিষ্টাব্দের ৪ অক্টোবর, চট্টগ্রাম জেলার বোয়ালখালি উপজেলার এতিহ্যবাহী কধুরখিল গ্রামে। তিনি একজন মানবতাবাদী ও সমাজসচেতন প্রাবন্ধিক, লেখক ও সমাজচিন্তক। দেশ-বিদেশ সাময়িকীতে তার

২০টির অধিক গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত একটি সাময়িকীতে দীর্ঘদিন ধরে চিকিৎসা বিজ্ঞান বিষয়ে নিয়মিত লিখাচ্ছেন তিনি। শিক্ষাজীবনে ব্রাবরই মেধাবী ডা. আশিষ কুমার চৌধুরী ১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দে কধুরখিল হাইস্কুল থেকে কৃতিত্বের সাথে এস এস সি, ১৯৭৩ এ সম্পূর্ণ মেধা তালিকায় স্থান নিয়ে চট্টগ্রাম কলেজ থেকে এইচ এস সি এবং ১৯৭৯ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম স্থান অধিকার করে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস পাশ করেন। ১৯৮৪ খ্রিষ্টাব্দে সরকারি কলারশিপ নিয়ে সার্জারিতে পোস্ট গ্র্যাজুয়েশন এবং ১৯৮৮ খ্রিষ্টাব্দে শল্য চিকিৎসায় পি এইচডি ডিপ্লোমা লাভ করেন। ২০০৭ খ্রিষ্টাব্দে তিনি দিল্লিতে লাপারাকেপিক সার্জারিতে বিশেষ প্রশিক্ষণ নেন। ২০০৯ খ্রিষ্টাব্দে তিনি 'এইডস' ও সার্জারিতে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। ডা. আশিষ কুমার চৌধুরী বুয়েটে অধ্যয়নরত পুরুষ উচ্চাস ও চিকিৎসাশাস্ত্রে অধ্যায়নরত কন্যা মৌসুমীর পরিত পিতা। ডা. চৌধুরীর যাবতীয় কর্মসূলোগের অন্তর্বর্তীন প্রেরণাদাত্রী তার স্ত্রী শ্রীমতি শুভিয়া চৌধুরী।

